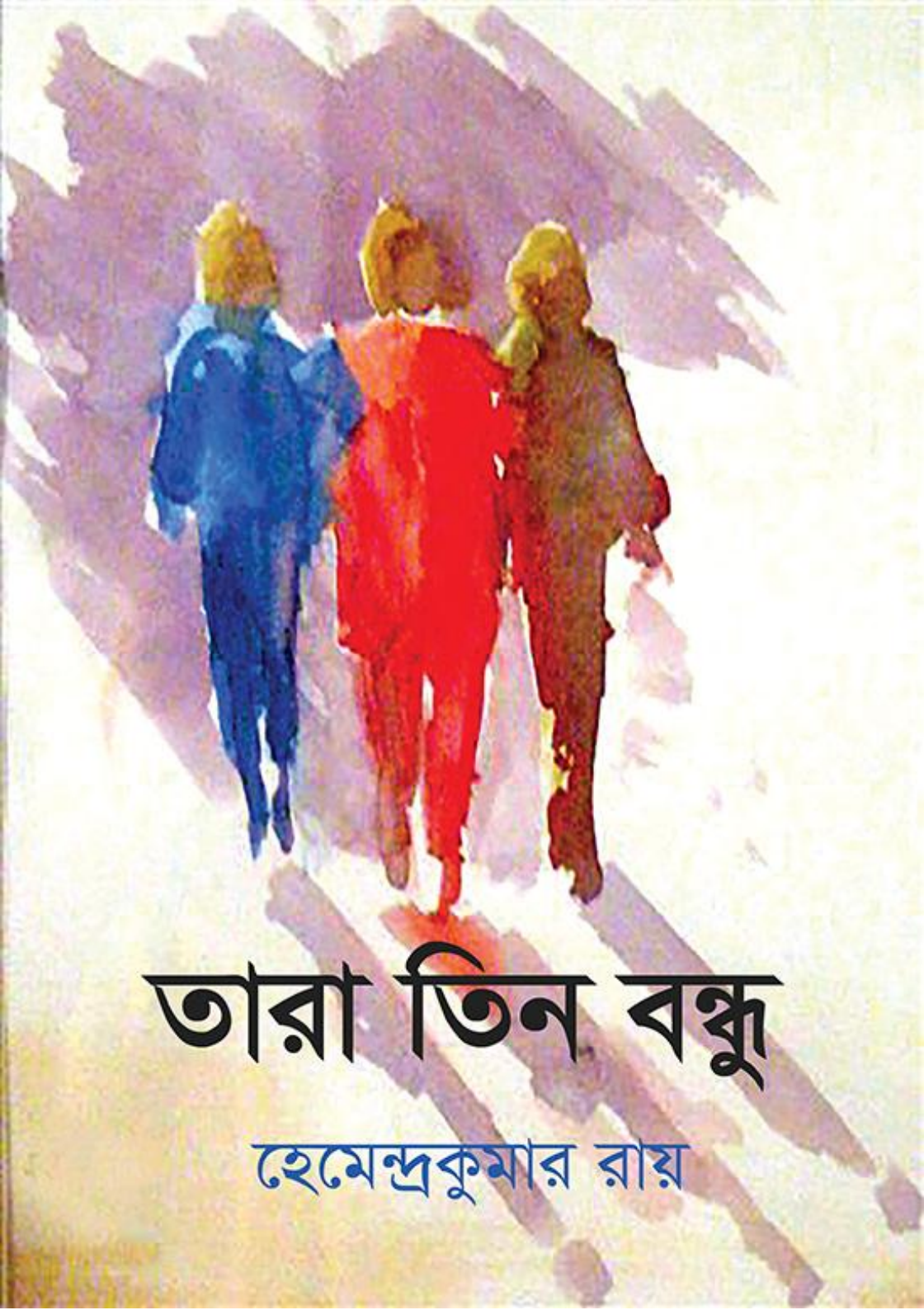

তারা তিন বন্ধু

হেমেন্দ্রকুমার রায়

তারা তিন বন্ধু

হেমেন্দ্রকুমার রায়

কুকুর-কাহিনি

অটল, পটল ও নকুল সেদিন সন্ধ্যাবেলায় চায়ের দোকানে বসে আছে। হঠাৎ রাস্তা থেকে একটা মিশকালো বিলাতি কুকুর এসে চায়ের দোকানের ভিতরে ঢুকল।

নকুল খাচ্ছিল একখানা কেক। কুকুরটা লুব্ধ চোখে তার মুখের পানে তাকিয়ে আছে দেখে নকুল এক টুকরো কেক তার দিকে নিক্ষেপ করলে। সেটুকু খেয়ে ফেলেই কুকুরটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে টপ করে নকুলের কোলের উপরে লাফিয়ে উঠে দিলে তার গাল চেটে।

নকুল খাপ্পা হয়ে এক ধাক্কা মেরে তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে কোঁচার খুঁটে নিজের মুখ মুছতে লাগল।

চায়ের দোকানের কোণে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। কুকুরটা তার কাছে গিয়ে ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দিলে। তার দিকে এক টুকরো রুটি ফেলে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, কুকুরটা দেখছি খুব দামি!

অটল এক মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠে বললে, দামি? এর কত দাম হবে?

ভদ্রলোক বললেন, তা বলতে পারি না। তবে এর যদি 'পেডিগ্রি' থাকে তাহলে হাজার টাকা দামও হতে পারে। এটা কার কুকুর?

অটল অম্লানবদনে বললে, আমাদের। এর নাম টম। আয় রে টম, আয়! টম, টম!

পটল ডাকলে, জ্যাক!

নকুল ডাকলে, জিমি!

কিন্তু কুকুরটা কোনও ডাকই গ্রাহের মধ্যে আনলে না। অটল তখন বকলস ধরে তাকে হিড় হিড় করে কাছে টেনে আনলে। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে

একবার সন্দিগ্ধ-চোখে তিন বন্ধুর পানে তাকিয়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পটল বললে, কী হে, কুকুরটাকে তুমি ধরে রাখলে কেন? বেচে ফেলবে নাকি?

অটল বললে, উহু! বেচতে গিয়ে বিপদে পড়ব নাকি? শুনছি কুকুরটা দামি। নিশ্চয় কোনও বড়োলোকের কুকুর, পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছে। ওকে ফিরে পাবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা হতে পারে।

নকুল বললে, ও আমার কুকুর।

—কী রকম?

—আমি ওকে কেক খেতে দিয়েছি। ও আমার গাল চেটে দিয়েছে।

বেশ, আমিও তাহলে ওকে ওমলেট খেতে দিচ্ছি।

পটল বললে, আমিও বিস্কুট দিচ্ছি।

কুকুরটা বুদ্ধিমান। ওমলেট ও বিস্কুট কিছুই ছাড়লে না।

অটল বললে, কুকুরটা এখন আমাদের তিনজনেরই হল। পুরস্কারের টাকাও আমরা তিনজনে ভাগ করে নেব। চলো, একে নিয়ে বাসায় যাই।

কিন্তু রাস্তায় নেমে কুকুরটা তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হল না। তিনজনে তাকে নিয়ে ঠেলাঠেলি টানাহাচড়া করছে, এমন সময়ে দেখা গেল একটা পাহারাওয়ালা তাদের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

তারা ভয় পেয়ে কুকুরের জন্যে তখনই একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে ফেললে।

বাসার সামনে নেমে নকুল বললে, কিন্তু মেসের লোকেরা কুকুর দেখলে কী বলবে?

অটল বললে, তারা দেখতে পেলে, তবে তো? আজ রাতটা ওকে আমাদের ঘরের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে পারব।

রাত যখন নিশুতি তখন বিকট চিৎকারে অটলের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বেলে সে দেখলে, কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে কুকুরটা শেয়ালের মতন গলায় প্রচণ্ড চিৎকার জুড়ে দিয়েছে—ও-ও-ও-ও, ও-ও-ও-ও, ও-ও-ও-ও।

পটল ও নকুল আঁতকে জেগে উঠল। তারপরই ঘরের বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ ও দরজায় দুম-দাম ধাক্কা শোনা গেল।

বাইরে থেকে কে বললে, ব্যাপার কী? ব্যাপার কী?

বিপদে নকুলের মাথা খুব খেলে, সে বললে, আমাদের অটল দাঁত-কটকট করছে বলে কেঁদে সারা হচ্ছে।

বাহির থেকে আর-একজন বললে, বাপ রে, দাঁত-কটকট করলে মানুষ যে অমন করে চ্যাঁচাতে পারে, তা এই প্রথম জানলুম।

আর-একজন বললে, আমার মনে হচ্ছে যেন, কুকুরের কান্না।

আর-একজন বললে, আটলবাবুর দাঁত ফের কটকট করলে আমরা পুলিশ ডাকব।

অটল চাপা-গলায় মুখ খিঁচিয়ে এবং নকুলকে ঘুসি দেখিয়ে বললে, পাজি ছুঁচো কোথাকার! কাল আমি মুখ দেখাব কেমন করে? আমাকে কুকুর বানিয়ে ছাড়লে!

পটল আর নকুল হি হি করে হাসতে লাগল।

পরের দিন ভোরবেলায়, মেসের লোক জাগবার আগেই তিন বন্ধু কুকুর নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

কুকুরটা ক্রমাগত লম্বা দেবার চেষ্টা করছে দেখে তার জন্যে একগাছা শিকল কেনবারও দরকার হল। অটল একটা লাইব্রেরিতে ঢুকে খবরের

কাগজগুলো উলটেপালটে দেখে এসে বললে, না, পুরস্কার ঘোষণা করে এখনও কেউ বিজ্ঞাপন দেয়নি।

পটল বললে, কুকুর নিয়ে এমন টো টো করে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব!

নকুল বললে, আজ রাত্রে অটলের আবার দুঁত-কটমট করলে মেসের লোক বিশ্বাস করবে না।

অটল বললে, চৌধুরিদের বাগানের মালি বনমালীকে আমি চিনি। যতদিন না পুরস্কার ঘোষণা হয়, এ আপদকে তার জিন্মায় রেখে আসি চলো।

পটল বললে, তার চেয়ে ও-আপদকে এখুনি বিদায় করে দাও না ভায়া! অটল মাথা নেড়ে বললে, ইল্লি নাকি? ওর জন্যে আমাদের ট্যাকের পয়সা খরচ হয়নি?

চৌধুরিদের বাগানের বনমালী বললে, কুকুরটাকে আমি হস্তা-খানেকের জন্যে বাগানে বেঁধে রাখতে পারি, কিন্তু ওর খোরাকি জোগাবে কে?

অটল ঠং করে একটা টাকা ফেলে দিলে।

দিন-দুয়েক পরে বনমালী বাগানে বসে কতকগুলো ফুলগাছের শুকনো ডাল কেটে দিচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে দেখে, একজন এয়া গালপাট্টা-গোঁফওয়ালা বেঁটে পেটমোটা লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে বাবুদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। তারও হাতের শিকলিতে বাধা আর একটা মিশকালো কুকুর।

বনমালী বললে, কাকে খুঁজছেন মশাই?

লোকটা বললে, কারুকে খুঁজছি না, তোমাদের কুকুরকে দেখছি। ও বোধহয় আমার কুকুরের যমজ ভাই!

দুটো কুকুরই তখন পরস্পরকে দেখে ভয়ানক তর্জন-গর্জন ও লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে—দুজনেই যেন দুজনকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে চায়?

—না মশাই, ও কারুকে কামড়ায় না।

—আমার কুকুরও আগে কামড়াত না, কিন্তু পরশু খুকিকে আর কাল গিন্নিকে কামড়েছে। দু-চার দিনের মধ্যেই ওকে বিদায় করে দিতে হবে দেখছি, নইলে গিন্নি নাকি বাপের বাড়ি চলে যাবেন।

বনমালী বললে, কিন্তু দুটো কুকুরই তো দেখতে অবিকল একরকম! একবার চোখের আড়াল হলে আমি চিনতেই পারব না কোনটা কার কুকুর!

—চিনতেই পারবে না? বটে!

লোকটা খানিকক্ষণ ভেবে বললে, এ দুটো কুকুরের গলার মাপও একরকম কি না দেখি! সে নিজের কুকুরের বকলস খুলে অন্য কুকুরটার গলায় পরালে এবং তার বকলসটা নিজের কুকুরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে, আরে, এদের গলার মাপও যে একরকম! নিশ্চয় এরা যমজ ভাই!

বনমালীর তখন বাজে কথা কইবার অবসর ছিল না, সে আবার নিজের কাজে মন দিলে।

পরের দিন সকালে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসেই বিপুল উৎসাহে অটল বললে, কেল্লা মার দিয়া! পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

তিন বন্ধু ঊর্ধ্বশ্বাসে বনমালীর সন্ধানে ছুটল। বনমালীর কাছ থেকে কুকুর নিয়ে তারা তাড়াতাড়ি চলে গেল বটে, কিন্তু মিনিট-পনেরো পরেই আবার হস্তদন্তের মতন ফিরে এল। তখন বাগানের মাটি কোপাচ্ছিল বনমালী।

অটল মারমুখো হয়ে বলে উঠল, হতভাগা, বদমাইশ! এ কার কুকুর?

—না, না! এ আমাদের কুকুর নয়! বকলসটা আমাদের বটে, কিন্তু কুকুরটা একেবারে নতুন! যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, সে দেখেই চিনে ফেলেছে! হায়, হায় পঞ্চাশ টাকা!

বনমালীর তখনই মনে পড়ে গেল, কালকের সেই গোঁফ-গালপাট্টার কথা। সে মনে মনে সমস্তই বুঝতে পারলে, কিন্তু মুখে এমন ভাব দেখালে, যেন কিছুই বুঝতে পারেনি।

নকুলের দাও-মারা

অটল ও পটল বিমর্ষ মুখে বাড়ির সামনেকার রোয়াকে চুপ করে বসে আছে। আজ সকালে উঠে তারা পকেট ঝেড়ে দেখেছে—তাদের দুজনের কাছে মোট সাড়ে উনিশটি পয়সা আছে। তা ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রায় যাকে বলে, ভাঁড়ে-মা-ভবানী আর কী? এমন অবস্থায় কাষ্ঠহাসি ছাড়া আর কোনওরকম হাসিই হাসা যায় না।

কিন্তু অটল ও পটল কাষ্ঠহাসি হাসতে নারাজ। তাই তাদের মুখ বিমর্ষ। তাদের একমাত্র আশা এখন নকুল। দেশে একমাত্র জমি-জমা আছে। সেই জমি-ভাড়ার টাকা সে অনেক দিন পরে আদায় করতে গিয়েছে।

আজ নকুলের আসবার কথা। তারই পথ চেয়ে অটল ও পটল রোয়াকে বসে আছে তীর্থের কাকের মতন।

খানিক পরে দেখা গেল, একখানা গোরুর গাড়ির আগে আগে নকুল আসছে বাসার দিকে।

পটল বললে, নকুলের মুখ হাসি হাসি, নিশ্চয় খবর ভালো।

অটল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললে, কী হে ভায়া, টাকা দিয়েছে?

নকুল বললে, দিয়েছে বটে, কিন্তু অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে। আজ তিন বছর পরে গেলুম, মোটে আড়াই শো টাকা।

অটল বললে, হিপ হিপ হুর রে!

পটল জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু নকুল, তোমার সঙ্গে গোরুর গাড়ি কেন? গাড়ির ওপরে অতবড়ো বাক্সে করে কী এনেছ হে? আমাদের জন্যে ফল-ফসল নাকি?

নকুল রহস্যময় হাসি হেসে বললে, ওটা বাক্স নয়। ওর ওপর-দিকটা খোলা, অর্থাৎ লোহার ডান্ডা দিয়ে ঘেরা আছে। একবার উকি মেরে দেখেই এসো না।

কৌতুহলী অটল গোরুর গাড়ির উপরে গিয়ে উঠল। বাক্সটা তার চিবুক পর্যন্ত উঁচু। ডিঙি মেরে বাক্সের ভিতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেই সে বাপ। বলে চেচিয়ে রাস্তার দিকে লম্ফত্যাগ করলে।

পটল বললে, কী হল, কী হল?

অটল বললে, বাঘ!

—তুমি কী বলছ হে? বাপ, না বাঘ?

—দুই-ই। ওটা বাক্স নয়, খাঁচা। ওর ভেতরে আছে একটা মস্ত বাঘ!

—বাঘ?

নকুল বললে, হ্যাঁ। কিন্তু ভারী পোষ-মানা বাঘ!

অটল বললে, বাঘ যে পোষ মানে, এ কথা মানতে আমি রাজি নই। পটল, এখান থেকে সরে পড়ি এসো, নকুলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

নকুল বললে, তোমরা হচ্ছ কাপুরুষের অবতার। একটা পোষা বাঘকে এত ভয়। আগে সব কথা শোনো। আমাদের গাঁয়ের জমিদার বাঘটাকে পুষেছিলেন। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়েছেন। দেশে গিয়ে শুনলুম, জমিদারবাড়ির লোকেরা বাঘটাকে পুষতে রাজি নন। বিলিয়ে দিতে চান। এতবড়ো দাও মারবার সুযোগ আমি ছাড়তে পারলুম না। তাই বাঘটাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছি।

অটল মুখভঙ্গি করে বললে, মরে যাই! বুদ্ধির গলায় দড়ি। বাঘ নিয়ে তুমি কী করবে শুনি?

—সস্তায় বাঘ বিক্রি আছে বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব।

—মরা বাঘের চামড়া বিক্রি হতে পারে, কিন্তু একটা ধেড়ে জ্যান্তবাঘকে কেউ কিনবে না?

—ও-বাঘটা ধেড়ে নয়। নিতান্ত ছোকরা, বয়স মোটে চার বছর তিন মাস। সার্কাসওয়ালারা খবর পেলে এখনই কিনে ফেলবে।

পটল বললে, কিন্তু যতদিন না তারা খবর পায়, বাঘটাকে কোথায় রাখবে? আমাদের এটা হচ্ছে ফ্ল্যাটবাড়ি। বাড়ির ভেতরে অতবড়ো একটা বাঘ দেখলে ভাড়াটেরা কী-রকম গোলমাল করবে তা বুঝতে পারছ?

নকুল বললে, বাঘের খাঁচাটা থাকবে বাড়ির পাশের ওই জমিতে।

পরদিন নকুল বাঘের জন্যে বেশ-খানিকটা মাংস ও হাড়ের ছাট নিয়ে এল।

বাঘের খাওয়া দেখবার জন্যে অটল ও পটল কৌতুহলী হয়ে নকুলের সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বাঘ কিন্তু মাংসের ছাঁট দু-একবার শুকেই ব্যাঘ্র-ভাষায় একটি ছোট্ট গর্জন করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ল্যাজ আছড়াতে লাগল।

অটল বললে, জমিদারের বাঘ কিনা! আভিজাত্য আছে। মাংসের ছাঁটে মন ওঠে না— গোটা পাঁঠা খেতে চায়।

নকুল বললে, আমার মনে হয়, জমিদারবাড়ির জন্যে ওর মন কেমন করছে। সেখানে ও খাঁচার মধ্যে থাকত না—ওর জন্যে ছিল একটা বড়ো ঘর, আর খানিকটা রেলিং-ঘেরা জমি?

অটল সন্দিগ্ধ ভাবে বললে, খাঁচটা তেমন মজবুত নয় দেখছি। এখানেও ওকে বেশিদিন খাঁচার ভেতরে থাকতে হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

নকুল একটা লাঠি দিয়ে মাংসের ছাঁটগুলো বাঘের মুখের দিকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

বাঘ মহা-বিরক্ত হয়ে বিষম ধমক দিয়ে খাঁচার দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা সশব্দে খুলে গেল।

অটল, পটল ও নকুল—তিনজনেই একসঙ্গে সুদীর্ঘ লম্ফ-ত্যাগ করলে। তারপর—দৌড়, দৌড়, দৌড়।

দোতালায় উঠে নিজেদের ফ্লাটে ঢুকে অটল দরজা বন্ধ করবার জন্যে ফিরেই দেখে, বাঘও দোতলায় এসে হাজির হয়েছে।

দরজা বন্ধ করা আর হল না। তিনজনেই একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। নকুল একটা টেবিলের উপর উঠে সেখান থেকে লাফ মেরে ঘরের লোহার কড়ি ধরে ঝুলতে লাগল।

অটল ও পটল একটা সেকেলে খুব-উঁচু ও প্রকাণ্ড আলমারির উপরে কোনওরকমে উঠে পড়ে হুমড়ি খেয়ে বসে রইল।

বাঘও ঘর ভুল করলে না। সে-ও ভিতরে ঢুকে, প্রথমে কড়ি-ধরে দোদুল্যমান নকুলের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে অটল ও পটলকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

অটলের মনে হল, আগে কাকে ভক্ষণ করবে বাঘ সেই কথাই চিন্তা করছে। সে কম্পিত স্বরে চুপি চুপি বললে, বাঘটা খালি খালি আমার দিকেই তাকাচ্ছে। ভাই পটল, তুমি আমার সামনে এসো। আমি তোমার পিছনে গা ঢাকা দিই।

পটল দস্তুর মতন দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মতন বললে, না। তুমি হচ্ছ নরহস্তী, তোমাকে দেখে বাঘের জিভে জল আসা অসম্ভব নয়।

অটল বললে, মানলুম। সেইজন্যেই তো আমার বুক টিপ টিপ করছে। আর আমি যদি নরহস্তিই হই, তুমি হচ্ছ মানুষ-হাড়গিলে। তোমাকে দেখে বাঘের লোভ উপে যেতে পারে, অতএব তুমি সামনে এসো।

পটল জোরে মাথা নেড়ে বললে, পাগল! এমন সাংঘাতিক পরীক্ষায় আমি রাজি নই। তোমার আড়ালে আমি নিরাপদে আছি। বাঘ মোটেই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

কিন্তু অটল নাছোড়বান্দা, সে পটলের পিছনে যাবার জন্যে গুতোগুতি শুরু করলে— পটল যত বাধা দেয়, তার গো তত বেড়ে ওঠে।

একে অটল-পটলের দেহের ভারে আলমারিটার মাথা রীতিমতো ভারী হয়ে উঠেছিল, তার উপরে আবার এই প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি!

হঠাৎ আলমারিটা হেলে দড়াম করে মাটির উপর পড়ে গেল। নকুল এতক্ষণ দুই চোখ মুদে কড়ি ধরে ঝুলছিল। আলমারি পতনের শব্দে এবং অটল ও পটলের আর্তনাদে দারুণ ভয়ে তার দেহ হিম ও দুই হাত অবশ হয়ে গেল এবং পরমুহূর্তে আঙুল আলগা হয়ে গিয়ে কড়ি থেকে সে অবতীর্ণ হল একেবারে বাঘের পিঠের উপরে।

ওদিকে ভূপতিত আলমারির মাথা থেকে দুই-দুইজন মানুষকে দুই দিকে ছিটকে পড়তে দেখে, বাঘ বিপুল বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল।

তারপরেই যখন হাউমাউ করে চেঁচিয়ে তার পিঠে এসে পড়ল নকুল, তখন এমন অভাবনীয় হুলুস্কুলু কাণ্ড সে আর সহ্য করতে পারলে না। ভয়ে ও রাগে গাঁ গাঁ করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বাঘ তৎক্ষণাৎ সেই বিপজ্জনক ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তিনজন মানুষের সঙ্গে বাঘের চিৎকার এবং আলমারি ও নকুলের দেহের পতনশব্দ শুনে ফ্ল্যাটবাড়ির সমস্ত ভাড়াটিয়া হইচই তুলে ছুটে এল।

কিন্তু তার পরই মূর্তিমান ব্যাঘ্রের আবির্ভাব দেখে তাদের পিলে গেল চমকে। বলা বহুল্য, তৎক্ষণাৎ যে যেদিকে পারলে দৌড় মেরে দমাদম শব্দে দরজাগুলো বন্ধ করে দিলে। এদিকে বাঘের পিঠ থেকে মেঝের ওপরে আছড়ে গড়িয়ে পড়ে নকুলের ধারণা হল সে আর বেঁচে নেই।

সে আর টু-শব্দ উচ্চারণ করলে না, বোধহয় মরা মানুষের কথা কওয়া উচিত নয় বলেই।

অটল ও পটল অল্প-বিস্তর চোট খেয়েছিল বটে, কিন্তু তারা সেই অবস্থাতেই আত্মরক্ষার চেষ্টা ভুললে না।

অটল হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় গিয়ে ঢুকল, এবং পটল চটপট উঠে ঘরের দরজায় দিলে খিল তুলে।

বাড়ির কে থানায় ফোন করে দিয়েছিল, থানা থেকে বন্দুকধারী পাহারাওয়ালার সঙ্গে ইনস্পেকটার এসে দেখেন—বাঘটি খাচায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

খাচার দরজা বন্ধ করার শব্দে বাঘ মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলে—তারপরই আবার মুখ নামিয়ে চোখ মুদে ফেললে। বাঘের ভাব দেখে বেশ বোঝা যায়, খাঁচার বাইরে আসবার জন্যে তার মনে আর কোনও আগ্রহই নেই।

ইনস্পেকটার বললেন, বাঘটা দেখছি পোষা। একে বধ করে লাভ নেই।

ইনস্পেকটার বললেন, তা হলে বাঘটাকে অলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

নকুল সাগ্রহে বললে, উত্তম প্রস্তাব।

মহারাজা চোর-চুড়ামণি বাহাদুর

অপূর্ব বাগচী স্ট্রিটে আজকাল বড়োই চোরের উপদ্রব হয়েছে।

এ চোর হচ্ছে বিষম চোর। উপর-উপরি বারো-চৌদ্দ খানা বাড়িতে চুরি হয়ে গেল, কিন্তু পুলিশ কোনও চুরিরই কিনারা করতে পারলে না।

গোয়েন্দা বিভাগের মস্ত মস্ত মাথাওয়ালারা মাথা ঘর্মাক্ত করে অবশেষে আবিষ্কার করে ফেললেন, এসব চুরি মাত্র একজন চোরের কীর্তি নয়।

কিন্তু এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ফলেও চুরি বন্ধ হল না। বুদ্ধিমান চোরেরা বেছে বেছে ঘটনাস্থল নির্বাচন করেছিল চমৎকার। কারণ অপূর্ব বাগচী স্ট্রিটে যারা বাস করেন, তাদের অধিকাংশই ধনবান বলে বিখ্যাত। এমনকি তাদের মধ্যে একজন রাজাবাহাদুর ও একজন স্যার উপাধিধারীরও অভাব নেই।

অটল-পটল-নকুল লক্ষ্মীপ্যাঁচার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলেও আজকাল ওই রাস্তাতেই বাস করত।

পাড়ায় একটি শখের থিয়েটার-ক্লাব ছিল, তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন রাজা দুর্গাপ্রসাদ ও স্যার গঙ্গারাম!

গেল দুই রাত্রে তাদের দুজনেরই অট্টালিকার মধ্যে বিনা সমারোহে চোরের শুভাগমন হয়েছিল।

রাজাবাহাদুর ও স্যার গঙ্গারাম চোরেদের উপরে হয়েছেন অগ্নিশর্মা এবং পুলিশের উপরে হারিয়েছেন বিশ্বাস। তারা দুজনে ঘোষণা করলেন, যে চোর ধরতে পারবে তাকে তাঁরা হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করবেন।

অটল বললে, হে মা কালী, যদি দশ টাকার পুজো পেতে চাও, তাহলে চোরকে একটিবার মাত্র আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।

পটল দীর্ঘশ্বাস ফেলে গানের সুরে বললে, হায় রে, এমন দিন কি হবে মা তারা?

নকুল বললে, আমাদের বাড়িতে এলেও চোর তো আর ঢোল বাজাতে বাজাতে আসবে না। সে এখন এসে কখন পালাবে কেমন করে আমরা জানব?

অটল বললে, তবু প্রস্তুত হতে দোষ নেই। হাজার টাকা কম টাকা নয়। এসো, খানিকক্ষণ পরামর্শ করা যাক।

মা কালী অটলের প্রার্থনা শুনলেন।

বাতি জ্বেলে দেখলে, একটা মহা লম্বা-চওড়া যমের মতন দেখতে চোর তার আলমারির পাল্লা ধরে টানাটানি করছে।

অটল এক গাল হেসে বললে, অবশেষে তুমি এসেছ বন্ধু? আমি যে তোমার পথ চেয়েই জেগে জেগে নাক ডাকাচ্ছিলুম।

চোর গর্জন করে একখানা চকচকে ছোরা বার করলে।

ফস করে একটা রিভলভার বার করে অটল বললে, শান্ত হও ভায়া, শান্ত হও। ছোরার চেয়ে রিভলভার বড়ো জিনিস, এ কথা জানো তো? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

ভয়ে আজ তিন দিন ধরে আমাদের বাড়ির সব দরজাই খোলা রেখেছি। আর দেওয়ালের উপরে ওই যে ইলেকট্রিক-ঘণ্টার বোতাম দেখছ, তোমার পায়ের শব্দ পেয়েই ওটি আমি টিপে দিয়েছি। কেন জানো? ওই বোতাম টিপলেই বাড়ির আর-দুটো ঘণ্টা বাজবে, আর আমার দুই বন্ধু জেগে উঠে পাড়ার লোককে খবর দিতে ছুটবে!..

দরজার দিকে অত ঘন ঘন তাকাচ্ছ কেন? ভাবছ, হঠাৎ এক লাফে পগার পার হবে? আর সময় নেই ভায়া, আর সময় নেই। ওই শোনো, সিড়ির ওপরে পায়ের শব্দ। পাড়ার লোকেরা খবর পেয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে!

তিন-চার মুহূর্ত পরেই ঘরের মধ্যে পটল ও নকুলের সঙ্গে প্রবেশ করলেন রাজাবাহাদুর, স্যার, গঙ্গারাম ও আরও বারো-তেরো জন লোক।

সকলেরই হাতে মোটা মোটা লাঠি। অটল খাট থেকে নেমে এসে বললে, 'প্রিয় চোর, এইবারে ছোরাখানা পরিত্যাগ করো দেখি।

চোর ছোরাখানা ছুড়ে ফেলে দিলে। সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে অটল বললে, যদি চাও তো এই রিভলভারটা এখন তোমাকে দান করতে পারি। এটি হচ্ছে আমাদের ক্লাবের থিয়েটারি-রিভলভার—একেবারে কাঠ দিয়ে তৈরি!

রাজাবাহাদুর দুই পা পিছিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, রাসকেলকে এখনই পুলিশের হাতে সপে দেওয়া হোক।

স্যার গঙ্গারাম বললেন, এ চোরটা হচ্ছে এখন অটলবাবুর সম্পত্তি। উনি যা বলেন তাই হবে।

অটল বললে, পটল। নকুল! চোরকে নিয়ে যা যা করতে হবে, তোমাদের সব মনে আছে তো?

পটল ও নকুল ঘাড় নাড়লে। অটল বললে, চলুন এইবারে সবাই মিলে ক্লাবের দিকে যাত্রা করা যাক।

রাজাবাহাদুর ও স্যার গঙ্গারামও কৌতুহল দমন করতে পারলেন না, সকলের সঙ্গে তারাও ক্লাবে গিয়ে হাজির হলেন।

চোরকে একখানা টুলের উপর বসিয়ে সবাই তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রইল। নকুল একখানা পকেটবুক ও পেনসিল নিয়ে এগিয়ে এসে বললে, হে চোর, তোমার নাম কী?

চোর জবাব দিলে না।

পটল বললে, ওর নাম ছিঁচকে।'

জবাব নেই।

পটল বললে, ছিঁচকে এখনও কথা কইতে শেখেনি। লেখো, ওর বয়স এক বছর দুমাস দেড় দিন।

নকুল বললে, ছিঁচকে, তোমার ঠিকানা কী?

পটল বললে, নিশ্চয়ই চোরা-বাজারে।

অটল বললে, ছিঁচকে, তোমার গা দিয়ে বড়োই দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। তোমাকে এখন স্নান করতে হবে।

পটল বললে, এ বাড়ির পিছনেই একটা ছোটো পুকুর আছে। ছিঁচকেকে সেইখানে নিয়ে চলো।

তখন পৌষ মাসের শেষ, কনকনে শীত। বাড়ির পিছনে ছিল একটা পানায় ভরা পচা পুকুর। পুকুরের দিকে তাকিয়েই চোর বলে উঠলে, আমি সাঁতার জানি না।

পটল ও নকুল একসঙ্গে বলে উঠল, ছিঁচকে কথা কইতে শিখেছে—ছিঁচকে কথা কইতে শিখেছে!

অটল বললে, ছিঁচকে আজ যখন কথা কইতে শিখেছে, তখন সাঁতারই বা শিখবে না কেন? নকুল, একগাছা মোটা দড়ি নিয়ে এসো তো!

দড়ি বাঁধা হল চোরের কোমরে। পটল ও নকুল তাকে ধরে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলে।

বাবা রে, মা রে' বলে বিকট আর্তনাদ করে চোর জলের ভিতরে ডুবে গেল নিরেট পাথরের মতন। অটল তখন দড়ি ধরে তাকে আবার ডাঙার উপরে টেনে তুললে।

পটল ও নকুল আবার তাকে ধাক্কা মারলে—আবার সে জলের ভিতরে পড়ে ডুবে গেল।—অটল আবার তাকে উপরে টেনে আনলে। এমনি ব্যাপার চলল খানিকক্ষণ ধরে। অটল বললে, মনে হচ্ছে পাক আর জল খেয়ে খেয়ে ছিঁচকের ভুড়ি রীতিমতো ফুলে উঠেছে। আরও জল খেলে ওর ভুড়ি ফেটে যেতে পারে।

রাজাবাহাদুর বললেন, ওর ভূড়ি ফাটবার আগে শীতের চোটে কেঁপে কেঁপে আমি মারা পড়ব যে! এইবারে ওকে থানায় পাঠিয়ে দাও।

অটল বললে, আমার সম্পত্তি পুলিশের হাতে সমর্পণ করব না। পটল! নকুল! ছিঁচকেকে নিয়ে এইবারে কী করতে হবে মনে আছে তো? যাও, ওকে নিয়ে যাও?

পটল ও নকুল চোরকে নিয়ে ক্লাবের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাকি সবাই ক্লাবের রিহার্সাল-রুমে এসে দাঁড়ালেন। মিনিট-দশ পরেই পটল ও নকুল চোরকে সেখানে নিয়ে এল—তার মাথায় টিনের মুকুট, পায়ে জরির জুতো, পরনে রাজার পোশাক এবং একগালে চুন ও একগালে কালি।

সকলেই বুঝলেন এ পোশাক এসেছে থিয়েটারেরই ভাণ্ডার থেকে।

অটল বললে, পটল, একখানা বড়ো কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে কালি দিয়ে লেখো— মহারাজা চোর-চূড়ামণি বাহাদুরা নকুল কাগজখানা তুমি গদ দিয়ে ছিচকের পিঠের ওপরে মেরে দাও!

চোরের দুই গাল বয়ে গড়িয়ে পড়ছিল তখন ঝর ঝর করে চোখের জল।

স্যার গঙ্গারাম বললেন, তোমাদের থিয়েটারের অভিনয়ের চেয়ে আজকের পালাটা আমি বেশি উপভোগ করছি।

চোরের দিকে তাকিয়ে অটল বললে, হে মহারাজ, আপনি ক্রন্দন করছেন কেন?

পটল বললে, আমোদের চড় খেয়ে। মহারাজ কিছুতেই রাজবেশ পড়তে রাজি হচ্ছিলেন না।

চোর বললে, না হুজুর, সেজন্যে আমি কাঁদছি না। ও-রকম চড়-চাপড় খাওয়ার অভ্যাস আমাদের আছে। কিন্তু এর পরেও আমাকে নিয়ে আরও কী করতে চান, তাই ভেবেই আমার কান্না পাচ্ছে।

অটল বললে, মহারাজ, নির্ভয় হোন। আর আমাদের কোনও কর্তব্য নেই। আপনি এখন অনায়াসেই স্বরাজ্যে প্রস্থান করতে পারেন।

চোর বললে, তাহলে আমার কাপড়-চোপড়গুলো ফিরিয়ে দিন।

অটল বললে, উহু! জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দ্যাখো। সকালের আলো ফুটেছে। রাজবেশে রাস্তায় তোমাকে দিব্যি মানাবে।

চোর চমকে উঠে বললে, বাপ রে, এ পোশাকে আমাকে পথে দেখলে লোকে যে আমার পিছনে ঢিল ছুড়তে ছুড়তে তাড়া করবে!

—তা করবে। তোমার জন্যে আমি তিন রাত ঘুমোইনি। আমার ঘুম পেয়েছে। শিগগির বেরোও এখান থেকে।

চোর ধপাস করে বসে পড়ে আবার কেঁদে ফেলে বললে, আমি যাব না। তার চেয়ে আমাকে পুলিশে দিন।

অটল, পটল ও নকুল তিনজনেই চোরের পিঠে মারলে তিন লাথি। চোর তখন তাড়াতাড়ি পলায়ন করতে বাধ্য হল। রাজাবাহাদুর বললে, হাতে পেয়ে চোরটাকে ছেড়ে দেওয়া ভালো হল না। অটল বললে, ভেবে দেখুন রাজাবাহাদুর, ওর মুখে আজকের গল্প শুনলে আর কোনও চোরই কি এ পাড়ায় উকি মারতে সাহস করবে?

কেমন করে তোতলামি সারে

নতুন বেহারাটি তোতলা—অসম্ভব রকম তোতলা। সেদিন সকালে অটল তাকে বললে, বনমালী—বনমালী!

বনমালী বলতে চায় 'হুজুর', কিন্তু তার মুখ দিয়ে বেরুল খালি হু-হু-হু-হু-হু-হু-হু—!

পটল বললে, থাক বনমালী, থাক। তুমি যা বলতে চাও বুঝেছি। কথা থামিয়ে কাজ করো দেখি। বিশু ময়রার খাবারের দোকান চিনতে পারবে তো?

বনমালী বলতে চায়, 'পারব', কিন্তু বার-দশেক 'পা' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে অক্ষম হয়ে হতাশ ভাবে কেবল মাথা নেড়েই জানালে—হ্যাঁ।

অটল ও পটল তো হেসেই অস্থির, কিন্তু নকুল একবারও হাসবার চেষ্টা করলে না। বরং তার মুখ দেখলে মনে হয় সে যেন অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে।

অটল বললে, কী হে বনমালী, আবৃত্তি শুনেও তোমার মুখে হাসির চিহ্ন নেই কেন?

নকুল গম্ভীরভাবে বললে, আমি হাসব কেমন করে ভাই? আমি যে ভুক্তভোগী।

পটল বললে, তার মানে?

নকুল বললে, তখন তোমাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ছিলুম ভয়ানক তোতলা,—হয়তো বনমালীরও চেয়ে।

পটল আশ্চর্য হয়ে বললে, তোমার তোতলামি সারল কেমন করে হে?

নকুল বললে, সে এক ইতিহাস। শুনতে চাও তো বলতে পারি।

অটল বললে, নিশ্চয়ই শুনতে চাই।

নকুল আরম্ভ করলে,—

তোতলামির জন্যে জীবনটা আমার ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। বন্ধুদের হাসি-কৌতুক, অপরিচিতদের বিদ্রুপ, এসব ছিল আমার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, কোনও নতুন লোক আমার সঙ্গে কথা কইতে এলেই, আমার মাথায় যেন ভেঙে পড়ত আকাশ।

অবশেষে এক বড়ো ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে গেলুম!

ডাক্তার আমাকে শুধোলেন, আপনার কী দরকার?

আমি বললুম, আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ

ডাক্তার বললেন, কী বলতে চান, বলুন।

—আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ-আ

ডাক্তার বললেন, বুঝেছি। গান গেয়ে বলুন।

'গা-গা-গা-গা-গা-গান...?

—হ্যাঁ, গান গেয়ে।'

আমি হতভম্বের মতন তাকিয়ে রইলুম।

ডাক্তার বললেন, প্রায়ই দেখা যায়, যেসব তোতলা মানুষ সাধারণভাবে কোনও কথাই বলতে পারে না, গানের সুরে কথা বলতে তাদের আর বাধা হয় না। আপনি যা বলতে চান, গান গেয়ে আমাকে বলুন।

আমি গানের সুরে বললুম—

আমার বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু তোতলা বলে কেউ আমাকে পছন্দ করছে না। বড়োই বিপদে পড়েছি ডাক্তারবাবু! আপনি যদি একটা উপায় বাতলে দেন।

ডাক্তার বললেন, বিশেষভাবে কোন কোন কথা আপনার আটকে যায়?

আমি আবার গান গাইবার উপক্রম করতেই ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, না, আর গান নয়। আপনার বক্তব্য লিখে জানান।

একখানা কাগজ নিয়ে পেনসিলের সাহায্যে আমি আমার তোতলামির কথা বর্ণনা করলুম।

কাগজখানা পাঠ করে ডাক্তার খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, বিশেষ শক্ত 'কেস' নয়। এ রকম কেস আমি আরোগ্য করেছি। আপনাকে একটা উপায় বলে দিতে পারি।

আমি গান গেয়ে বললুম, বলুন ডাক্তারবাবু, আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

ডাক্তার বললেন, তোতলামি হচ্ছে একটা মানসিক ব্যাধি মাত্র। তোতলারা প্রায়ই মুখচোরা হয়। কথা কইতে গিয়ে ভয় পেয়ে থতোমতো খেয়ে তাদের কথা আটকে যায়। আপনাকে কী করতে হবে শুনুন। প্রতিদিনই আপনি অন্তত তিনজন অচেনা মানুষের কাছে কথা কইবার চেষ্টা করবেন, তা হলেই দেখবেন, দিনে দিনে আপনার কথা কইবার ভয় কমে যাচ্ছে, আর আপনার তোতলামিও কমে যাচ্ছে একটু একটু করে।

ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার হাতে আটটি টাকা গুজে দিয়ে, এই নতুন জ্ঞান নিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

তখন আমি দেশে থাকতুম। দেশে ফেরবার জন্যে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনের কামরায় উঠে বসলুম। ডাক্তার যে উপায় বাতলে দিলেন, সেটা ঠিক আমার মনের মতন হল না। স্বভাবতই আমার প্রকৃতি হচ্ছে লাজুক। চেনা লোকের সঙ্গেই আমি কথা কইতুম খুব কম, আর অচেনা লোক দেখলেই হয়ে যেতুম ঠিক বোবা।

ডাক্তারের উপদেশ মানতে গেলে এই স্বভাবটি আমাকে বদলাতে হবে দেখছি। কঠিন কর্তব্য! কামরায় আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু গাড়ি যখন ছাড়ে ছাড়ে, হঠাৎ এক মহা লম্বা ও বেজায় ষণ্ডা ভদ্রলোক কামরার ভিতরে এসে উঠলেন। ভাবলুম, একে নিয়েই পরীক্ষা শুরু করা যাক।

কিন্তু মনের ভিতর থেকে কোনও ভরসাই পেলুন না। লোকটির যে-রকম গুন্ডার মতন চেহারা, যদি চটে যায়!

কিন্তু আমার আগেই, ভদ্রলোক বেঞ্চের উপরে বসেই কথা শুরু করলেন, কী-কী-কী-কীকী-রকম মেঘলা দেখছেন! আজ-জ-জ-জ-জ-জল না হয়ে ছা-ছা-ছা-ছা-ছাড়বে না দেখছি।

বিষম দমে গেলুম, এই তোতলা ভদ্রলোকের কথার উত্তরে যদি আমিও তোতলামি প্রকাশ করি, তাহলে নিশ্চয়ই উনি ভেবে নেবেন আমি ওঁকে ব্যঙ্গ করছি। দরকার নেই বাবা কথা কয়ে! শেষটা কি ঘুসি খেয়ে প্রাণে মারা পড়ব?

কিন্তু আমি জবাব দিলুম না দেখে, ভদ্রলোক বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠলেন। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, কী-কী-কী-কী-কী-রকম লোক আপনি? জ-জ-জ-জ-জবাব দিচ্ছেন না যে ব-বব-ব-বড়ো। কা-কা-কা-কা-কালা? না বো-বো-বো-বাবা?

বুদ্ধিমানের মতন তখনই ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলুম, সত্যিই আমি কালা ও বোবা। ভদ্রলোক তখন ঠান্ডা হয়ে দরদ জানিয়ে বললেন, আ-আ-আ-আ-হা, কা-কা-কা-কালা বো-বো-বো-বো-বাদের কী-কী-কী-কী -ক-ক-ক-ক-কষ্ট।'

আমাদের দেশে যেতে হলে মাঝে একবার গাড়ি বদলাতে হয়।

যে-স্টেশনে গাড়ি বদল করতে হবে, সেখানে নেমে দেখলুম ট্রেন আসতে তখনও দেরি আছে। প্ল্যাটফর্মের উপরে পায়চারি করতে লাগলুম। তখন মেঘ কেটে গিয়েছে।

আকাশ সুনীল। পায়চারি করতে করতে স্টেশনের বাইরে গিয়ে পড়লুম। রাস্তায় কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হল না। জায়গাটি বড়ো নির্জন। কোনও অচেনা লোকেরা সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ না পেয়ে একটু হতাশ হয়ে পড়লুম।

একজায়গায় একখানা বাড়ি দেখলুম। তার ফটকের উপরে লেখা রয়েছে—পাগলা গারদ।

আচম্বিতে কোথা থেকে একটি মূর্তির আবির্ভাব হল। মাথায় তার কোনও প্রতিমা থেকে খুলে নেওয়া পুরোনো একটা মটুক। গায়ে জড়ানো লাল রঙের একখানা গামছা। পরনে হাফপ্যান্ট, পায়ে জরির জুতো। সে মাঝে মাঝে হাফপ্যান্টের পকেটে হাত পুরে দিয়ে আবার বার করে নিয়ে শূন্য হাতেই যেন কী ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলেছে। আমাকে দেখেই হাসিমুখে একবার ঘাড় নাড়লে।

যদিও লোকটির সাজপোশাক যুৎসই নয়, তবু আমি স্থির করলুম এর সঙ্গে খানিক আলাপ করলে মন্দ হবে না।

বললুম, চ-চ-চ-চ-চমৎকার নীল আকাশ।

সে বললে, আপনার ভালো লেগেছে শুনে সুখী হলুম। আমিই আজ আকাশকে চমৎকার হবার হুকুম দিয়েছি।

একটু ভড়কে গেলুম। তবু জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি কী-কী-কী-কী ছ-ছ-ছ-ছ-ছড়াতে ছ-ছ-ছ-ছ ছড়াতে যাচ্ছেন?

লোকটি একগাল হেসে বললে, মোহর। গরিবদের দেখলে আমার দুঃখ হয়, তাই তাদের মুঠো মুঠো মোহর দান করছি।

আরও বেশি ভড়কে গেলুম। বললুম, ও। শূন্য হাত মুঠো করে লোকটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, তুমিও একমুঠো মোহর চাও নাকি? এই নাও।

বললুম, 'ধ-ধ-ধ-ধন্যবাদ। আ-আ-আ-আপতত আ-আ-আ-আমার মোহর দ-দ-দ-দরকার নেই।

লোকটি এগিয়ে এসে তার হাতের ভিতর আমার হাত নিয়ে বললে, আমি হচ্ছি— চিনদেশের সম্রাট। ওই হচ্ছে আমার প্রাসাদ।' বলেই ইঙ্গিতে পাগলা-গারদের বাড়িটা দেখিয়ে দিলে।

বুকটা ধড়াস করে উঠল। বুঝলুম—খুব লোকের পাল্লায় পড়েছি! চিনসম্রাট আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে স্টেশনের একটা গুদামঘরের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, ঘরটি বেশ নির্জন, না?

মাথা নেড়ে সায় দিলুম একান্ত নাচারের মতন। এই নির্জনতা ভয়াবহ। চিনসম্রাট বললেন, আমি এখন তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই।

আমি বললুম তা-তা-তা-তা-তাই নাকি?

চিনসম্রাট বললেন, হ্যাঁ। নরবলি সম্বন্ধে তোমার মত কী?

ভয়ে ভয়ে জানালুম, নরবলি আমি মোটেই পছন্দ করি না।

চিনসম্রাট বললেন, তোমার পছন্দে-অপছন্দে কিছুই এসে যায় না। কারণ আমি নরবলি পছন্দ করি। আমার রাজ্যে রোজই নরবলি হয়। আজও হবে। এখন ঘরের ভেতরে ঢোকো দেখি।

নরবলি সম্বন্ধে সম্রাটের উদারতা দেখে আমার সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠল। মনে হল আমার শরীর যেন রোমাঞ্চিত হবার চেষ্টা করছে।

জানালুম বড়ো বা ছোটো কোনওরকম ছুরিই আমার কাছে নেই। সম্রাট এতক্ষণের পরে আমার হস্ত ত্যাগ করে বললেন, ওইখানে চুপ করে একটু দাঁড়াও, আমি একবার ঘরটা খুঁজে দেখি ছুরি কি কাটারি পাওয়া যায় কি না।

পরমুহূর্তেই আমি মস্ত এক লাফ মেরে—সম্রাটের অগোচরেই ঘরের বাইরে এসে পড়লুম। তারপর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দিকে পাই পাই করে ছুটতে লাগলুম।

তখন ট্রেন এসে পড়েছে। আর-এক লাফে একখানা কামরার ভিতর গিয়ে পড়ে একেবারে বেঞ্চির তলায় ঢুকে অদৃশ্য হবার ব্যবস্থা করলুম।

সেই অবস্থায় বেঞ্চির তলায় উবু হয়ে শুয়ে হাফ ছাড়তে ছাড়তে দেখি, কামরার ভিতর এসে ঢুকলেন একটি আধা-বয়সি মহিলা। হাতে ছাতা, খবরের কাগজ ও খানকয়েক কেতাব।

মহিলাটি ডাকলেন, কুলি, কুলি, স্টেশনে অত গোলমাল কীসের?

কুলি বললে, গারদ থেকে একটা পাগলা পালিয়েছে।

সর্বনাশ! বলে শিউরে উঠেই মহিলা গাড়ির দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন। ট্রেন চলতে লাগল, খানিক পরে মহিলাটির দেহের উপরার্ধ একখানা খোলা খবরের কাগজের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ সুযোগ আমি ছাড়লুম না। অতিশয় নিঃশব্দে একটু একটু করে দেহ সরিয়ে বেঞ্চির তলা থেকে আমি আত্মপ্রকাশ করলুম।

তারপর বেঞ্চির উপর উঠে বসে একটা সুদীর্ঘ আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আঃ' শব্দটি উচ্চারণ করলুম।

যে-কামরাতে এতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল না, সেখানে হঠাৎ এই মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনেই মহিলাটি এমন ভয়ানক চমকে উঠলেন যে, খবরের কাগজখানা তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল। তার মুখ একটা দেখবার মতন অপূর্ব জিনিস।

কিন্তু তিনি একটিও কথা উচ্চারণ করলেন না। যেন একেবারে থ হয়ে গিয়েছেন।

যদিও মেয়েদের সামনে আমি আরও বেশি মুখচোরা হয়ে পড়তুম, তবু স্থির করলুম এঁর সঙ্গে দুই-চারিটা বাক্য-বিনিময় করা উচিত।

কারণ, ডাক্তার ব্যবস্থা দিয়েছেন, প্রতিদিন আমাকে অন্তত তিনজন সম্পূর্ণ-অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কইতে হবে।

কিন্তু বাক্যালাপ করতে গিয়েই তোতলামির বিপুল বন্যায় আমার কথা বলবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

আমার ভাবভঙ্গি লক্ষ করে, মহিলাটিরও দুই চোখ ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল।

তখন চট করে মনে পড়ে গেল ডাক্তারবাবুর আর একটি উপদেশ। সাধারণ ভাবে কথা কইতে না পারলে গানের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

আমি গানের খুব মধুর সুরে বললুম, দেখছেন আজকের আকাশ কী চমৎকার সুনীল। আজ আর বৃষ্টির ভয় নেই, কী বলেন?

মহিলাটি কিছুই বললেন না। কিন্তু তার মুখ হয়ে গেল নীল নদের মতোই নীল। গদির উপরে হেলে পড়ে তিনি সভয়ে দুই চোখ মুদে ফেলে একেবারে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। বুঝলুম সুরে বা বেসুরে কোনও রকমেই এর সঙ্গে কথা চলবে না।

তখন কী আর করি, পকেট থেকে 'থার্মোফ্লক্স' বার করে নিয়ে চা পান করতে নিযুক্ত হলুম।

হঠাৎ একটা মোড় ফিরতে গিয়ে ট্রেনখানি বেজায় দুলে উঠল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত থেকে ফ্লাস্কটা নীচে পড়ে গিয়ে ফেটে গেল সশব্দে।

মহিলাটি বিকট চিৎকার করে রবারের মতন উপরদিকে লাফিয়ে উঠলেন। এবং দুই হাতে অ্যালার্ম 'চেন' ধরে দোদুল্যমান হলেন।

প্রথমটা আমি অতিশয় অবাক হয়ে গেলুম, কারণ বসে বসে কোনও মানুষ যে এমন উঁচু লাফ মারতে পারে আগে আমার সে ধারণাই ছিল না।

কিন্তু তারপরই যখন দেখলুম যে চলতি ট্রেন থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং চারিদিকে জাগল অনেক লোকের দ্রুত পায়ের শব্দ, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে করলুম লম্ফ ত্যাগ।

এক পলকেই দেখে নিলুম গাড়ি থেমেছে একটা ময়দানের মাঝখানে, এবং মাইলখানেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা রীতিমতো বড়ো জঙ্গল। আমি সেই জঙ্গল লক্ষ্য করে দৌড় মারলুম।

দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আমার সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারত না। স্থির করলুম সেই শক্তির দৌলতেই আজ আমাকে দেহের হাড় ও পিঠের চামড়া রক্ষা করতে হবে।

দৌড়তে দৌড়তে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখতে পেলুম, দলে দলে লোক আমাকে ধরবার জন্যে নানা দিক থেকে ছুটে আসছে।

তাদের কেউ রেলের কর্মচারী, কেউ গায়ের লোক, কেউ বা চাষা কি রাখাল। অনেকেরই হাতে লাঠি দেখতেও ভুললুম না।

গুনতিতে তারা বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট জনের কম হবে না। এত তাড়াতাড়ি কী করে যে এত লোকের টনক নড়ল, সবিস্ময়ে সেই কথা ভাবতে ভাবতে আমি নিজের পায়ের গতি দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ বাড়িয়ে দিলুম।

জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়েও বুঝলুম, এই নাছোড়বান্দা জনতা এখনও আমাকে গ্রেপ্তার করবার আশা ছাড়েনি।

একটা বেজায় ঝুপসি বটগাছের উপরে গিয়ে আত্মগোপন করলুম খুব সাবধানে। তারপর রাত যখন দশটা বাজল তখন আবার আমি ভূমিষ্ঠ হলুম।

অটল, এই হচ্ছে আমার ইতিহাস।

অটল বললে, কিন্তু তোমার তোতলামি সারল কী করে সে কথা তো বললে না?

নকুল বললে, ঠিক কোন মুহূর্তে আমার এই কণ্ঠদেশের ভিতর থেকে তোতলামির শিকড় নষ্ট হয়ে গেল, তা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু গভীর রাত্রে বাড়িতে ফিরে এসে সেদিন যখন লোকের কাছে আমার কথা জাহির করলুম— তখন আশ্চর্য হয়ে অনুভব করলুম, আর আমি তোতলা নই। মহা বিপদের এক ধাক্কাতেই তোতলামি আমার গলদেশ ছেড়ে পলায়ন করেছে।

বিশ্বাস করো আর না করো এটা সত্যি কথা।

কার্তিকপুজোর ভূত

নতুন মেসবাড়ি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এখনও ব্যবসাদারির গন্ধ বিকট ভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি। এখনও মাছের ঝোলে আঁশ বা কাঁটার বদলে সত্যিকার মৎস্য পাওয়া যায়, এখনও ডাল বলতে বোঝায় না কেবল ঘোলাটে জল এবং এখনও আলুর দম বা কালিয়ায় তৈলের ব্যবস্থা হয়নি ঘৃতাভাবে।

তেতলায় পাশাপাশি তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে তিন বন্ধুতে দিব্য আরামে হাত-পা ছড়িয়ে বাস করছিল। তিন বন্ধু অর্থাৎ অটল, পটল ও নকুলের কথা বলছি। কিন্তু একটু গোলমাল বাঁধল। চাঁদের আলো এবং ফুলের গন্ধের মতন মানুষের সুখ-শান্তিও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ভগবানের সৃষ্টি এইসব অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা নিয়ে অটল, পটল ও নকুল একসঙ্গে বিলক্ষণ মাথা ঘামিয়েছে, কিন্তু সঙ্গত কারণ খুঁজে পায়নি।—ব্যাপারটা এই।

সেদিন সকালবেলায় মেসের কর্তার ঘরে বসে অটল, পটল ও নকুল চা-পান ও হালুয়া ভক্ষণ করছে, এমন সময়ে একটি নতুন লোকের আবির্ভাব।

লোকটির মাথায় বাবরি-কাটা চকচকে চুল, গোঁফটির দুই প্রান্ত সুচারুরূপে পাকানো, গায়ের পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবির তলা থেকে রাঙা গেঞ্জির রং ফুটে বেরুচ্ছে, পায়েও রঙিন মোজা ও বাহারি জুতো। কিন্তু বেচারার শৌখিনতা প্রকাশের এত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে একটিমাত্র কারণে। তার ডান চোখটি কানা!

কিন্তু তার সেই একটিমাত্র চক্ষু যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি চটুল ও চটপটে। ঘরে ঢুকেই বোধহয় আধ-সেকেন্ডের মধ্যেই সেখানে বিরাজমান চার মূর্তির আপাদমস্তক সে ভালো করে দেখে নিলে।

মেসের কর্তা শুধোলে, মশাই কী চান?

—আমার নাম ননিনাথ নাগ। এই মেসে বাসা বাঁধতে চাই। এখানে আগেও একবার বাসা বেঁধেছিলুম।

—তা কী করে হবে? আমার এ মেসের জন্ম হয়েছে মোটে এক মাস।

—তা হতে পারে। কিন্তু এখানে আগেও একটি মেস ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে তিন বৎসর।'

—ও, বটে, বটে? এ খবরটা আমি জানতুম না।

—মশাই তাহলে নতুন মালিক? বেশ, বেশ! বলি, এখানে একখানা ঘর-টর খালি পাওয়া যাবে?

—দোতলার সব ঘর ভরতি। তেতলায় একখানা ঘর খালি আছে—

ননি একেবারে আঁতকে উঠে একটিমাত্র চক্ষুকে দুইগুণ বাড়িয়ে তুলে বললে, ওরে বাপ রে, তেতলায়? অসম্ভব!

—অসম্ভব? কী অসম্ভব?

—তেতলায় থাকা।

—কেন?

—আগে এখানকার তেতলায় কেউ থাকত না। অর্থাৎ থাকতে চাইত না।

—কেন?

—আগে তেতলায় ওঠবার সিঁড়ির দরজায় লাগানো থাকত তালা-চাবি।

—কেন মশাই, কেন?

—আগে সন্ধের পর কেউ এখানে তেতলার নাম পর্যন্ত মুখে আনত না।

—আরে মশাই –কেন, কেন কেন? নিজের মনে খালি বক-বকই করে যাচ্ছেন, আসল কথা বলবার নাম নেই।'

ননি মালিকের মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে একটিমাত্র চক্ষু মুদে বললে, নিতান্তই শুনবেন তাহলে?

—নিশ্চয় শুনব। আলবত শুনব। না শুনে আপনাকে ছাড়ব না। এমন খাসা তেতলার চারিদিক-খোলা ঘর, কেন এখানে কেউ থাকত না?

ননি কণ্ঠস্বর নামিয়ে, অদ্বিতীয় চক্ষুটিকে প্রাণপণে বিস্ফারিত করে বললে, আজ্ঞে, তেতলায় যে একজন আছেন।

অটল চায়ের পেয়ালা নামিয়ে এতক্ষণ পরে বললে, একজন আছেন মানে?

পটল বললে, কে বলে একজন? আমরা হচ্ছি তিনজন।

নকুল বললে, হ্যাঁ, তিনখানা ঘরে আছি আমরা তিনজন।

ননি হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, ভালো কাজ করেননি।

মালিক খাপ্পা হয়ে বললে, এসব কথার মানে? আপনি কি আমার মেসের লোক ভাঙাতে এসেছেন?

—তাতে আমার লাভ?

—তবে এত বাজে বকছেন কেন?

—বেশ মশাই, আমি আর কিছু বলতে চাই না। একতলার কোনও ঘর যদি খালি থাকে তো বলুন। না থাকে, পোটলা-পুটলি নিয়ে ধুলো-পায়েই প্রস্থান করব।

—'কতলার তিনখানা ঘর খালি আছে, আপনি যেটা খুশি নিতে পারেন।

অটল বললে,কিন্তু মহাশয়,আপনি আমাদের কৌতুহল জাগ্রত করেছেন। আমাদের কৌতুহল আবার যতক্ষণ না নিদ্রিত হয়, ততক্ষণ আপনাকে এইখানেই বন্দি হয়ে থাকতে হবে।

পটল বললে, তেতলা আপাতত আমাদের অধিকারে। সুতরাং আসল কথা জানবার অধিকার আমাদের আছে।

নকুল মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, তেতলায় একজন আছেন মানে কী?

ননি একখানা ‘মোড়া’ টেনে নিয়ে বসে পড়ে নাচার ভাবে বললে, তবে সব কথাই শুনুন মশাই। এই মেসবাড়ির তেতলায় বাস করেন গদাধর গাঙ্গুলি।

মালিক বিস্মিত কণ্ঠে বললে, আপনি কি পাগল?

অটলও বিস্মিত কণ্ঠে বললে, গদাধর গাঙ্গুলি! তিনি থাকেন তেতলায়, অথচ আমরা কেউ জানি না। আমাদের তিন জোড়া চোখ কি অন্ধ?

ননি বললে, লক্ষ জোড়া চর্মচক্ষু থাকলে গদাধর গাঙ্গুলিকে দেখা যায় না। তিনি অশরীরী।

পটল ও নকুল চমকে উঠে বললে, কী বললেন?

—তিনি অশরীরী। আহা, একদা তিনিও শরীরী ছিলেন। তিন বছর আগে আমি যখন এই মেসে ছিলুম, তার কিছু আগেই তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন।

অটল, পটল ও নকুলের দেহ রীতিমতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

মালিক হতভম্বের মতন কেবল বললে, মানে?

ননি বললে, মানে হচ্ছে এই। আমি এই মেসে আসবার কিছুকাল আগে, তেতলার একটি ঘরে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে গদাধর গাঙ্গুলি নামে একটি ভদ্রলোক আফিম খেয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন।

মালিক বললে, এতক্ষণ পরে তবু কিছু হদিস পাওয়া গেল। তারপর?

—তারপর কিন্তু দেহত্যাগ করেও গদাধরবাবু এই মেসের তেতলার ঘরের মায়া ত্যাগ করতে পারেনন।ি অনেকেই তাঁকে তেতলার ছাদে বেড়িয়ে বেড়াতে দেখেছেেএমনকি তাঁর শখের গান গাইতে শুনেছে।

—শখের গান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমিও দোতলা থেকে তার শখের গানটি শুনেছি।

—সেই শখের গানটি কী?

ননি সুরে বললে—

বাজে তালি, বাজে ধামা।
ওরে যদু! আরে মধু!
শোন গাই সা-রে-গা-মা!
ধেড়ে-কেটে, তেড়ে-কেটে-লেগে যায় তাক।
মোর গীতে ভেঙে যায় দুনিয়ার জাঁক।
দীপকের তা-না-না-না,
শুনে যাও মামি-মামা!
গিটকিরি শুনে ডেকে ওড়ে কাক-চিল,
উৎসাহে নিধু মারে যাকে-তাকে কিল।
ছোটে গাধা, ছোটে ধোপা,
ছোটে খোকা দিয়ে হামা।

মালিক অভিভূতের মতন বললে, আহ, কী গান! শুনলে অশ্রুবর্ষণ করা অনিবার্য।

অটল করুণভাবে বললে, নিশ্চয়। আমারও পাষণ্ড চক্ষু সজল হবার চেষ্টা করছে। কারণ আমি ওই তেতলাতেই থাকি।

পটল সায় দিয়ে বললে, আমারও ওই অবস্থা—যদিও এখনও গদাধরবাবুর নিজের মুখের গান শোনবার সৌভাগ্য হয়নি।

নকুল ম্রিয়মান ভাবে বললে, বোধহয় তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমরা রাত দশটা বাজবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি।

ননি বললে, ঠিক আন্দাজ করেছেন। যারা পৃথিবীর দেহ ত্যাগ করেও পৃথিবীতে বাস করেন, রাত বারোটা বাজবার আগে তাদের দেখা পাওয়া অসম্ভব।

ননি বললে, ব্যাকুল না হতে পারেন, কিন্তু আমি শুনেছি, গদাধরবাবু প্রতি বৎসরে এক দিন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে জোর করে আলাপ করবার চেষ্টা করেন। সেদিন নাকি ইচ্ছা করলেই সবাই তাঁকে দেখতে পায়।

মালিক বললে, মানে?

—গদাধরবাবু প্রতি বৎসরে এক রাত্রে তার বাৎসরিক কর্তব্যপালন করতে আসে।

—মানে?

—যে তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, প্রতি বৎসরে ঠিক সেই তারিখেই গদাধরবাবু আবার চর্মচক্ষুগোচর দেহ ধারণ করেন। আবার আফিম খান। আবার আর্তনাদ করেন। এবং তারপর আবার মরেও মারা পড়েন।

মালিক বললেন, রাত বারোটার পরে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রাত বারোটার পরে কলকাতার কোনও আফিমের দোকান খোলা থাকে না।

—মশাই, এসব হচ্ছে পরলোকের কথা। পরলোকে কোন দোকান কখন বন্ধ হয়, আমি তা কেমন করে বলব? ইহলোকের সমস্ত আমার নখদর্পণে—কোন পাড়ায় ক-টা গাঁজা আফিমের দোকান আছে তাও বলে দিতে পারি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরলোক সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই।

মালিক ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, এইসব গাঁজাখুরি গল্প বলে আপনি কি আমার মেসবাড়ির দরজা বন্ধ করতে এসেছেন?

ননিও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, গাঁজা? আমি ভদ্রলোক। গাঁজার দোকানের ঠিকানা জানি বটে, কিন্তু গাঁজা কাকে বলে জানি না। আমি এসেছি মেসের একখানি ঘর নিতে। একতলায় একখানি ঘর পেলেই আমি খুশি হব।

মালিক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চলুন। কিন্তু আপনাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি আগাম টাকা চাই।

ননি বললে, তাই নিন না। এ বাড়ির তেতলার ঘর ছাড়া আর সব ঘরেই যেতে আমি প্রস্তুত। বিশেষ আজকের রাত্রে।

মালিক বললেন, আজকের রাত্রে? মানে?

ননি বললে, গদাধরবাবু মরদেহ ত্যাগ করেন নাকি কার্তিকপুজোর রাত্রে। তিনি বাৎসরিক ব্রত পালন—অর্থাৎ আবার আফিম খেয়ে দেহত্যাগ করতে আসেন ঠিক সেই রাত্রেই। এটা তার কী খেয়াল জানি না, কিন্তু শুনেছি, কার্তিকপুজোর রাত্রে তিনি আবার একবার দেহত্যাগ করবার অভিনয় না করে থাকতে পারেন না। অনেকটা সাপের খোলস ত্যাগের মতনই আর কী! চলুন মশাই, এসব বাজে কথা থাক। একতলায় আমাকে একখানা ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসবেন চলুন।

ননিকে নিয়ে মালিক প্রস্থান করলে। অটল কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শিস দিতে দিতে হঠাৎ থেমে বললে, আজই কার্তিকপুজো।

পটল দুঃস্বপ্নাভিভূতের মতন বললে, কিন্তু গদাধরবাবু যে কোন ঘরে দাঁড়িয়ে বা বসে বা শুয়ে আফিম খেয়ে তাঁর বাৎসরিক ব্রত পালন করেন সে কথা তো জিজ্ঞাসা করা হল না।

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে নকুল বললে, জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। যতটুকু শুনেছি, তাই-ই যথেষ্ট। আজ যদি সৌভাগ্যক্রমে গদাধরবাবুর সঙ্গে দেখা না হয়, তাহলে কালকেই এ বাসাকে নমস্কার করে সরে পড়ব।

অটল ও পটল একসঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞের মতন বললে, হ্যাঁ।

সে-রাত্রে অটল, পটল ও নকুল এক-এক খানা ঘরে একলা থাকা যুক্তিসঙ্গত বা নিরাপদ বলে মনে করলে না। পটল ও নকুল আপন আপন ঘর ত্যাগ করে এসে অটলের বিছানার ডান বা বাম পাশে নিজেদের বিছানা পেতে নিলে!

গদাধরবাবুকে বাঁধা দেবার জন্যে অটল ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা ভালো করে বন্ধ করে দিতে লাগল।

পটল বললে, অটল, ননির কাহিনি বিশ্বাস করলে বলতে হয়, গদাধরবাবু হচ্ছেন সূক্ষ্মদেহধারী। সূক্ষ্মদেহের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, ইটকাঠ-পাথরও ভেদ করে আনাগোনা করা যায়।

নকুল বললে, পটল, স্তব্ধ হও। সাবধানের মার নেই।

নিজের বিছানার উপরে এসে বসে অটল বললে, ঘড়িতে দেখছি রাত দশটা বাজে। ঘুমোবার সময় হল। কিন্তু আজ আমরা কী করব? ঘুমব? না গদাধরের আগমন-প্রতীক্ষা করব?

নকুল হাই তুলে বললে, রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। মারাত্মক বললেও চলে।

পটল লেপের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, আমারও ওই মত। গদাধরবাবুর বাৎসরিক অভিনয় দেখবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি ঘুমিয়ে তাঁকে ফাঁকি দিতে চাই।

অটল বললে, আমার বিশ্বাস, গদাধরবাবুর কথা হচ্ছে রীতিমতো উপকথা। উপদেবতার কথা মাত্রই উপকথা। সুতরাং অকারণে জেগে থেকে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। আলো নেবাও—ঘুমিয়ে পড়ো।

মিনিট-পাঁচেক পরেই তিনটি তন্দ্রা-পুলকিত নাসা-যন্ত্রের প্রচণ্ড ঘড়র-ঘড়র-মন্ত্রে একান্ত সন্ত্রস্ত হয়ে দেওয়ালবাসী টিকটিকিরা পর্যন্ত ভেন্টিলেটারের ভিতর দিয়ে বাইরে পলায়ন করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারা এতদিন এক অটলের নাসিকা-ধ্বনিকে কোনওক্রমে সহ্য করে ছিল। কিন্তু একসঙ্গে অটল-পটল-নকুলের তর্জনগর্জনময় নাসা-ভাষা! এ হচ্ছে দস্তুরমতন মেছোহাটার কোলাহল! যে-কোনও জীবের পক্ষেই সহ্য করা অসম্ভব।

কার্তিক মাসের শেষ তারিখের ভিজে হিমেল হাওয়া। কনকন কনকন। অটলের ঘুম গেল ছুটে। ধড়মড় করে উঠে বসে সে বলে উঠল, ওরে বাপ রে বাপ! কী ঠান্ডা!

সবচেয়ে-বেশি শীত-কাতুরে নকুল এর আগেই জেগে উঠেছিল। সে লেপের মাঝখানে ঢুকে গিয়ে ঘুম-জড়ানো স্বরে বললে, আমার মনে হচ্ছে, আমি এভারেস্টের সর্বোচ্চ শিখরের উপরে আরোহণ করে আছাড় খেয়েছি।

পটল বাক্যব্যয় করলে না। এপাশ থেকে ওপাশে ফিরে শুল।

অটল বললে,—বিস্মিত, হতভম্ব স্বরেই বললে, কিন্তু হাওয়া আসে কোত্থেকে? আমি নিজের হাতেই সব জানলা বন্ধ করে দিয়েছি।

নকুল একটিমাত্র চক্ষু উন্মোচন করে বললে, শার্সিহীন পুরনো জানলা, আলগা ছিটকিনি— হয়তো জোর-হাওয়া লাগলেই খুলে যায়।

—হতে পারে। কিন্তু এর আগে ওই উত্তরে জানলাটা এমন অসময়ে আর কখনও খুলে যায়নি'—এমনি গজ গজ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়ে আটল সশব্দে আবার জানালাটা বন্ধ করে দিল।...

তারপর পুনর্বার ত্রিনাসিকা মুখর হয়ে উঠল. এবং খানিক পরে আবার ভালো করে ঘুমোতে না ঘুমোতেই ভেঙে গেল তাদের ঘুম। সেই ঠান্ডা হাড়-কাপানো বাতাস। উত্তরের জানলাটা আবার খুলে গিয়েছে।

অটল চিন্তিত ভাবে বললে, ব্যাপারটা ভালো বলে বোধ হচ্ছে না।

পটল বললে, রীতিমতো সন্দেহজনক। জানলার এমন ব্যবহারের কল্পনা করা যায় না। ... নতুল, উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো তো?

নতুল দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, লেপের বাইরে যাবার ইচ্ছে আমার নেই।

অটল বললে, নকুল, তুমি দেখছি মহা কাপুরুষ! একটা জানলা বন্ধ করবার সাহসও তোমার নেই? রাবিস। সে শয্যাত্যাগ করবার উপক্রম করছে, এমন সময়ে গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজল।

নকুল শীতার্ত কণ্ঠে বললে, বারোটা!

পটল ম্রিয়মান স্বরে বললে, প্রেত-নগরের সিংহদ্বার এইবারে খুলে গেল।

অটল জানলা বন্ধ করবার জন্যে আর শয্যাত্যাগ করবার চেষ্টা করলে না। ঝাঁ ঝাঁ রাতে ডাকছে খালি ঝিঁঝিঁ পোকারা। শহরের আর সব শব্দই যে ভয়ে চুপ মেরে গিয়েছে। কিন্তু নীরবতার বক্ষ ভেদ করে একটা সুর শোনা যাচ্ছে না?

সুরটা আরও একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল। কে যেন বাইরে ছাদের কোণ থেকে গুন গুন করে গাইছে—

বাজে তালি, বাজে ধামা!
ওরে যদু! আরে মধু!
শোন গাই সা-রে-গা-মা!

অটল আড়ষ্ট ভাবে বললে, ইস, এ-যে গদাধরবাবুর গান!

পটল বললে, নকুল, ভাই আমার। চটপট জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো তো।

নকুল বললে, পাগল! গদাধরবাবু এসে আমাকে টানাটানি করলেও আমি আর লেপের ভেতর থেকে বেরুব না।

গান থামল। ছাদের উপরে শোনা গেল কার পায়ের শব্দ।

অটল ক্ষীণ স্বরে বললে, আমার মনে হচ্ছে, গদাধরবাবু এই ঘরে এসেই আফিম খেতে চান?

পটল আর নকুল একেবারে বোবা হয়ে গেল,—বোধহয় তারা ভাবলে, বোবার শত্রু নেই।

পায়ের শব্দ থেমে গেল। খানিকক্ষণ সব নিঃসাড়। তারপরই একটা নতুন-রকম ভয়াবহ শব্দ–ঠক ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে ঘরের ভিতরেই–পূর্ব দিকে এ যেন মাংসহীন অস্থিসার পায়ের শব্দ!

অটলের মাথার চুলগুলো তখন খাড়া হয়ে উঠেছে এবং দেহ হয়েছে অসম্ভব-রকম রোমাঞ্চিত। তবু সে বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার করে একটা কাঠি না জেলে থাকতে পারলে না।

ঘরের কোথাও কেউ নেই। পটল আর নকুল দুজনেই লেপের তলায় অদৃশ্য।

দেশলাইয়ের কাঠি নিবে গেল। তারপর আবার ঘরের ভিতরে শব্দ হল—ঠক ঠক ঠক! ঠক ঠকাঠক, ঠকাঠক, ঠকাঠক!

শীতেও ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে অটল ভাবতে লাগল, অতঃপর কী করা উচিত?..হঠাৎ তার মনে পড়ল প্রেততত্ত্ববিদদের কথা। প্রেতেরা নাকি প্রায়ই শব্দের সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করে। গদাধরবাবুও কি শব্দ করে কোনও কথা বলতে চাইছেন?

অত্যন্ত কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে অটল বললে, এ ঘরে যদি কেউ এসে থাকেন, তাহলে দয়া করে শুনুন। আমি প্রশ্ন করি, আপনি উত্তর দিন। আমার প্রশ্নের উত্তরে একবার শব্দ হলে বুঝব—'হ্যাঁ', আর দু-বার শব্দ হলে বুঝব—না'।

ঠক, ঠক, ঠক, ঠক ঠক ঠক!

—মশাই, অতবেশি শব্দ করে ভয় দেখালে মারা পড়ব। শুনুন। আপনি গদাধরবাবু?

একবার শব্দ হল—ঠক! অর্থাৎ—হ্যাঁ।

—আপনি কি বেঁচে আছেন?

দু-বার শব্দ হল—ঠক, ঠক! অর্থাৎ— না।

দুই হাতে চেপে নিজের হৃৎকম্প থামবার চেষ্টা করে অটল বললে, আপনি কি এখানে আফিম খেতে এসেছেন?

—ঠক। হ্যাঁ।

—আপনি কি আজ আফিম না খেয়ে থাকতে পারবেন না?

—ঠক, ঠক। না।

—আমরা এখানে থাকলে আপনি কি রাগ করবেন?

—ঠক। হ্যাঁ।

—আপনি নিশ্চয় আমাদের আক্রমণ করতে চান না?

—ঠক। হ্যাঁ।

পরমুহূর্তেই অটলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতা-পা-ওয়ালা মস্ত একটা দেহ। অটল বিছানা থেকে ছিটকে মেঝেয় গিয়ে পড়ে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল! এবং তার পরমুহূর্তেই পটল বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাপ রে, গদাধর আমার ঘাড়ে চেপেছে রে!

তারপরেই দড়াম করে খুলে গেল ঘরের দরজা এবং সেই অবস্থাতেই অটল বেশ বুঝতে পারলে যে, পটল ও নকুল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দুম-দাম শব্দে ছাদের উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, সে-ও তৎক্ষণাৎ গদাধরবাবুকে ফাঁকি দিয়ে শুয়ে-শুয়েই সরীসৃপের মতন সড়াৎ করে দরজার কাছে সরে গেল, তারপর উঠেই বাইরের ছাদের দিকে মারলে এক লম্বা লাফ!

অটল, পটল আর নকুল হুড়মুড় করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বারান্দার উপর নেমে দেখলে, এত রাতে সাত-পাড়া কাঁপানো গোলমাল শুনে মেসের সমস্ত লোক এসে জড়ো হয়েছে। সকলেরই ব্যস্ত কণ্ঠে একই জিজ্ঞাসা—ব্যাপার কী, ব্যাপার কী?

বারান্দার উপরে তিন জোড়া পা ছড়িয়ে বসে পড়ে তিন মূর্তি হাঁপাতে লাগল তিনটে হাঁপরের মতন। মেসের মালিক শুধোলেন, ও অটলবাবু, কী হয়েছে বলুন না!

অটল বাধো বাধো গলায় বললে, গদাধরবাবু আমার ওপরে লাফিয়ে পড়েছিলেন।

পটল বললে, না অটল। ভয়ের চোটে তোমার ওপরে ঝাঁপ খেয়েছিলুম আমিই। আর গদাধরবাবু লাফ মেরেছিলেন আমার পিঠের উপরেই। আমার প্রতি তাঁর এই অন্যায় পক্ষপাতিত্বর মানে হয় না।

নকুল বললে, না পটল। পালাতে গিয়ে তোমার ওপরে হোচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম আমিই। অন্ধকারে তুমি বুঝতে পারেনি।

মালিক অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হা হা করে হেসে বললে, এরই নাম রজ্জতে সর্পভ্রম! গদাধরবাবু হচ্ছেন গাঁজাখুরি গল্পের নায়ক। যান মশাই, যে-যার ঘরে যান। মিথ্যেই আমাদের ঘুম ভাঙালেন।

অটল প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললে, মাপ করতে হল মশাই! কে ঘরে যাবে? সেখানে গদাধরবাবু এতক্ষণে হয়তো আফিম গুলতে শুরু করেছেন।

মালিক বিপুল বিস্ময়ে বললে, মানে?

অটল বললে, হতে পারে দুরাত্মা পটল নির্বোধের মতন আমার ওপর ঝাঁপ খেয়েছিল, কিন্তু —

পটল বললে, হতে পারে কাপুরুষ নকুল ভয়ে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে আমার ওপরে হোঁচট খেয়েছিল, কিন্তু—

নকুল বললে, কিন্তু আমাদের এই ভ্রমের দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তেতলায় গদাধরবাবু নেই। কারণ আমরা সবাই স্বকর্ণে তার মার্কা-মারা গান, তার পায়ের শব্দ আর ঠকঠক ভাষায় তার কথা শুনেছি।

মালিক মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, তাই তো, শুনেছেন নাকি?

অটল বললে, নিশ্চয়! শুনেছি বলেই তো ভয় পেয়েছি।

মেসের আর কেউ ননির গল্প শোনেনি। সকলের কণ্ঠে একই প্রশ্ন জাগল—গদাধরবাবু কে?

মালিকের ইচ্ছা নয় যে, গদাধরবাবুর কাহিনি আর কারুর কর্ণগোচর হয়। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, গদাধরবাবু হচ্ছেন আমার পিসেমশাই, তাকে নিয়ে আপনাদের কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অটলবাবু, পটলবাবু, নকুলবাবু! আপনারা আমার ঘরেই আসুন। পিসেমশাই এত রাতে আপনাদের ঘরে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আফিমের মৌতাত মাথায় চড়লে পিসেমশাইয়ের আর কোনও জ্ঞান থাকে না,— আরে ছোঃ!

সকালের আলো দেখে তাদের পলাতক সাহস আবার প্রত্যাগমন করলে। মেসের মালিককে নিয়ে অটল নিজের ঘরে এসে ঢুকল, পটল এবং নকুলও গেল নিজের নিজের ঘরে! বলা বাহুল্য, বাৎসরিক ব্রত পালন করে গদাধরও তখন অদৃশ্য হয়েছে।

অটল কৌতুহলী ভাবে ঘরের এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে, এমন সময়ে পটল ঝড়ের মতন ছুটে এসে বললে, সর্বনাশ হয়েছে! আমার দরজার তালা ভাঙা, ট্রাঙ্কের তালা ভাঙা! আমার দশখানা দশ টাকার নোট চুরি গিয়েছে।

তারপরে—প্রায় তার পিছনে-পিছনেই ছুটে এসে নকুলও সমাচার দিলে, তার বাক্সের ভিতর থেকে উধাও হয়েছে একশো পনেরো টাকা আট আনা।

অটল চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে হাটু গেড়ে বসে পড়ল। তার চাবির তোড়া থাকত মাথার বালিশের নীচে। বালিশ তুলে দেখা গেল, চাবি নেই—কিন্তু একখানা চিঠি আছে।

চিঠিখানা এই:

অটল-পটল-নকুলবাবু,—

কাল সকালে গদাধর-কাহিনি বলে আমি বেশ একটি ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছিলুম— সেই আবহ রাত্রে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল দুই-দুই বার খোলা জানলা দেখে,— বলেন?

কিন্তু একটু কম-ভিতু হলে আপনারা অনায়াসেই অনুমান করতে পারতেন যে, বাহির থেকে অনায়াসেই খড়খড়ির পাখি তুলে হাত দিয়ে ছিটকিনি সরিয়ে জানলা খোলা যায়।

এ ঘরের ভেন্টিলেটারে'র ছাদা বড়ো হওয়াতে আমার ভারী সুবিধা হয়েছে। ওই পূর্ব দিকের মাঝের জানলার উপরকার 'ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে টোন-সুতোর ডগায় একখণ্ড নুড়ি বেঁধে বাহির থেকে আমি ঘরের ভিতরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলুম, আর সুতোর অন্য প্রান্ত ছিল আমার হাতে। এই হচ্ছে ঠক ঠক আওয়াজের গুপ্ত কারণ! বাহির থেকে কান পেতে আমি সুতোয় টান মেরে অটলবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।

গদাধরবাবুর গানটি এই অধীনেরই রচনা। ওটি কোনও মাসিকপত্রে ছাপিয়ে দিতে পারবেন?

আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের তেতলা থেকে তাড়ানো। কেন, তা বলা বাহুল্য।

আর বোধহয় মহাশয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না--বিদায়।

ইতি—

আপনাদের শ্রীননি

দেড়-ডজন জাহাজি-গোরা

কার্তিকপুজোর ভূতের ব্যাপারের পর কিছুকাল কেটে গেল বেশ নির্বিঘ্নে।

মেসবাড়ির অন্যান্য লোকগুলি ছিল অত্যন্ত নিরীহ, গোবেচারি। কেউ সরকারি আপিসে, কেউ সওদাগরি আপিসে, কেউ-বা রেল আপিসে ছোটোখাটো চাকরি করে। সকালে উঠে তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দু-চারটে ভাত গুঁজে ছুটে আপিসে বেরিয়ে যায়, তারপর সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যা বা সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে এসে বেশ খানিকক্ষণ ধুকতে থাকে; তখন তারা আর দুনিয়ার কোনও খবর নিয়েই বিশেষ মাথা ঘামাতে চায় না বা পারে না।

হঠাৎ একদিন এই ভেড়ার দলে সিংহের মতন এসে পড়ল একটি নতুন লোক। নাম তার নন্দলাল। মাথায় সে সাড়ে-ছয় ফুট উঁচু এবং চওড়াতেও তার বপুখানি রীতিমতো দেখবার মতন। সে কথা কয় জোরে জোরে, দুই হাত নাড়ে জোরে জোরে, মাটির উপর পা ফেলে জোরে জোরে। তাকে দেখলে প্রথমেই মনে জাগে কেমন-একটা আতঙ্ক! কালো রঙের উপরে তার মুখে ঝাঁটার মতন গোঁফ, আর দরোয়ানের মতন গালপাট্টা দেখলে মনের আতঙ্ক আরও বাড়ে বই কমে না। তার মাথার চুলগুলো বুরুশ-চিরুনির সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে সর্বদাই হয়ে থাকত বিশৃঙ্খল এবং শজারুর পৃষ্ঠদেশের মতন কণ্টকিত।

হস্তা-খানেকের মধ্যেই তার স্বভাবেরও যেটুকু নমুনা পাওয়া গেল তা বড়ো সুবিধাজনক নয়। বিপজ্জনকই বলা উচিত।

মেসের খাবারঘরে বসে আটল, পটল আর নকুল দক্ষিণ হস্তের কর্তব্য সম্পাদন করছে, এমন সময় নন্দ সেই ঘরে ঢুকে বললে, ঠাকুর, আমাকে খাবার দাও।

ঠাকুর বললে, আজ্ঞে, বসুন।

নন্দ অনেকখানি জায়গা জুড়ে ভালো করে জাঁকিয়ে বসে বললে, ঠাকুর, আজ দেখলুম না তোমাদের মস্তবড়ো একটা রুইমাছ এসেছে?

ঠাকুর বললে, হ্যাঁ বাবু, আজকের মাছটা খুব বড়ো।

নন্দ বললে, মাছের মুড়ো দিয়ে কী রাঁধছ বাপু?

ঠাকুর বললে, আজ্ঞে, মুড়োটা কালিয়ায় দিয়েছি। পটলবাবু বেশি দাম দিয়ে খেতে চান।

নন্দ বললে, পটলবাবু আবার কে?

পাচক পটলকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই যে, পটলবাবু বসে আছেন।

পটলের দিকে তাকিয়েই নন্দ হা হা হা হা করে, ঘর-ফাটানো অট্টহাসি হেসে উঠল। তারপর অত্যন্ত অবহেলা-ভরে বললে, আরে রাম, রাম, ওই তো তালপাতার সেপাই, অতবড়ো মুড়ো ও-দেহে সহ্য হবে কেন? আমি বেশি দামও দিতে পারি, একটা সের-তিনেক মাছ হজমও করতে পারি, মুড়োটা আমায় দিয়ো।

পাচক দ্বিধাভরে পটলের মুখের পানে তাকালে।

পটলের মুখ তখন রাগে লাল হয়ে উঠেছে। ক্রুদ্ধস্বরে সে বললে, ঠাকুর, ও মুড়ো আমার। এখনই আমার পাতে দিয়ে যাও।

নন্দ চিৎকার করে বললে, কী মশাই, মুড়োটা কি আপনি গায়ের জোড়ে কেড়ে নিতে চান? তাহলে জেনে রাখুন, এর আগেও কেউ কেউ আমার সামনে দাঁড়িয়ে গায়ের জোরের বড়াই করেছে! কিন্তু তার ফলে তাদের কোথায় যেতে হয়েছে জানেন? হাসপাতালে মশাই, হাসপাতালে।

নকুল নন্দের দেহের দিকে তাকিয়ে পটলের কানে কানে বললে, চেপে যাও ভাই, চেপে যাও! ও মুড়ো চুলোয় যাক।

পটল চেপেই গেল।

এমনি ব্যাপার হামেশাই হতে লাগল। রান্নাঘরের যা-কিছু ভালো খাবার সবই গিয়ে হাজির হয় নন্দের থালায়। মেসবাড়ির মালিকও নন্দকে ভয় করতে

লাগলেন যমদূতের মতন। আপিসের কেরানি-বেচারা তো নন্দের দিকে ভয়ে মুখ তুলে তাকাতেই পারে না। সমস্ত মেসবাড়ির ভিতরে একমাত্র প্রভু ও ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হয়ে উঠল নন্দলালই।

একদিন সন্ধেবেলায় অটল বাজাচ্ছে হারমোনিয়ম, পটল নিয়েছে তবলার ভার এবং নকুল গাইছে থিয়েটারি আবু হোসেনের একটি গান। সেদিন অটল ও পটল ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে কিছু টাকা হস্তগত করেছিল, গান-বাজনার দ্বারা সেই আনন্দকেই তারা স্মরণীয় করে তুলতে চায়। তাদের দলে একমাত্র গায়ক ছিল নকুল, বাংলা থিয়েটারের সব গানই তার প্রায় মুখস্থ।

নকুল গানের মধ্যে প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে দুই চোখ মুদে গাইছে—

আমার সরল প্রাণে ব্যথা লেগেছে,
বুঝেছি শিখেছি ঠেকে,
সোনার ছবি ভেঙে গেছে।

এমন সময় ঘরের দরজার কাছে জাগল একটা হুঙ্কার। অটলের হারমোনিয়ম, পটলের তবলা থেমে গেল, নকুলও চমকে গান থামিয়ে চোখ চেয়ে দেখলে, দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে নন্দলালের বিপুল বপু!

নন্দলাল ধমক দিয়ে বলে উঠল, এসব কী হচ্ছে শুনি?

অটল বললে, কী হচ্ছে বুঝতে পারছেন না? গান-বাজনা হচ্ছে।

নন্দ বললে, বাজনা যে বাজছে তা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু নকুলবাবু করছিলেন কী?

পটল বললে, নকুলবাবু গান গাইছিলেন।

নন্দ তার ভাটার মতন চোখ আরও বিস্ফারিত করে বললে, গান! নিমতলার মড়াকান্নাকে আপনারা গান বলে চালাতে চান? ওসব এখানে চলবে না মশাই। যতদিন আমি এখানে আছি, ততদিন ওসব চলবে না। মনে রাখবেন, সাবধান করে দিয়ে গেলুম।

নন্দের পায়ের শব্দ যখন তেতলা থেকে দোতলার সিঁড়ির উপরে নেমে মিলিয়ে গেল, অটল হারমোনিয়মটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে, জীবন যে ভারবহ হয়ে উঠল হে।

নকুল বললে, যেখানে আমার গানকে মড়াকান্না বলে সন্দেহ করা হয়, সেখানে আর আমি থাকতে চাই না।

পটল বললে, পাগল নাকি, আমার যাব কেন? ওই ভুঁইফোড়টাকেই এখান থেকে বিদায় করতে হবে।

অটল বললে, কেমন করে বিদেয় করবে? মেসের কর্তাও ওকে ভয় করেন। ওটা হচ্ছে গুন্ডা?

পটল বললে, গুন্ডা-ফুন্ডা আমি মানব না। আমি রুইমাছের মুড়ো খেতে ভালোবাসি, ওর জন্যে আমার পাতে আর মুড়ো পড়ে না। এসো, ভেবে-চিন্তে ঠিক করা যাক কী ব্রহ্মাস্ত্র ঝাড়লে নন্দের দপ চূর্ণ হয়।

দিন-তিনেক ধরে অটল, পটল ও নকুল রীতিমতো মাথা ঘামাতে লাগল।

অবশেষে প্রথম মাথা খুলে গেল নকুলের। হঠাৎ সে বলে উঠল, হয়েছে হয়েছে, উপায় হয়েছে!

অটল ও পটল সাগ্রহে বলে উঠল, কী উপায় ভাই, কী উপায়?

নকুল বললে, আমার চেয়ে তোমাদের দুজনের গায়ে ঢের-বেশি জোর আছে। তোমরা দুজনে নন্দকে একদিন রাস্তায় ধরে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে আসবে।

অটল বললে, ধ্যেৎ ভারী উপায়ই বাতলালেন!

পটল বললে, তারপর ও যখন আমাদের নামে থানায় গিয়ে নালিশ করবে?

নকুল বললে, নালিশ করবে কার নামে? তোমাদের চিনতে পারলে তো? তোমরা যে ছদ্মবেশ ধারণ করবে।

অটল বললে, ছদ্মবেশ!

নকুল বললে, হ্যাঁ। কলকাতায় এখন কত কাফ্রি সেপাই এসেছে দেখেছ তো? তোমাদের খাঁকি পোশাক আছে। আর আমি তোমাদের জন্যে এক-রকম বিলিতি কালো রং নিয়ে আসব। হাতে আর মুখে তোমরা সেই রং মাখবে। তারপর মাথার টুপি আর খাকি পোশাক পরে সন্ধ্যার পরে রাস্তায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। তারপর নন্দ যখন একলা পথ দিয়ে ফিরে আসবে, সেই সময় তোমরা দুজনে মিলে তাকে ধরে—বুঝেছ? এই ব্ল্যাক আউটের রাত্রে তোমাদের ছদ্মবেশ ধরা পড়া অসম্ভব!'

অনেক আলোচনার পর সেই ব্যবস্থাই ঠিক হল।

তিন দিন পরে। নন্দ বলে গেল, ঠাকুর, আজ আমি থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হবে। আমার জন্যে খাবার চাপা দিয়ে রাখবে।

রাত বারোটার সময় নন্দ যখন পাগলা ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে মেসের ভিতরে এসে ঢুকল, তখন সারা বাড়ির সকলেরই ঘুম গেল ভেঙে মেসের মালিক থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক ভাড়াটিয়া ও ঝি-চাকর পর্যন্ত হই হই করে ছুটে নীচে নেমে এসে দেখলে, উঠানের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে হাপরের মতন হাঁপাচ্ছে নন্দলাল। তার ডান চোখটা আগের মতন ফুলে উঠেছে, তার জামা-কাপড় ছিড়ে ফর্দা-ফাই এবং তার এক পায়ে জুতো নেই।

মেসের মালিক সবিস্ময়ে বললে, একী ব্যাপার নন্দবাবু, একী ব্যাপার!

নন্দ গর্‌জন করে বললে, War! War! রীতিমতো যুদ্ধ! আজ আমি যুদ্ধ করে এসেছি!

মালিক আরও বেশি বিস্মিত স্বরে বললেন, যুদ্ধ করে এসেছেন বলেন কী মশাই? কার সঙ্গে?

নন্দ বললে, কার সঙ্গে আবার? দেড়-ডজন জাহাজি গোরার সঙ্গে! ব্যাটারা মদ খেয়ে আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিল। হুঁ হুঁ, ব্যাটারা ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি। আমি একলাই তাদের এমন হাল করে ছেড়েছি যে, আর তারা কখনও বাঙালিপাড়ায় মুখ বাড়াতে ভরসা করবে না।

মালিক তারিফ করে বললে, বাহাদুর নন্দবাবু, বাহাদুর। কিন্তু তারা যে আপনার গোঁফের আধখানা ছিড়ে নিয়ে গেছে, এইটেই হচ্ছে পরিতাপের বিষয়।

নন্দ বললে, আধখানা গোফ তো তুচ্ছ ব্যাপার মশাই, বাঙালির মান রাখবার জন্যে আমি গোটা প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজি ছিলুম।

...আরও বেশি রাতে কালো র‍্যাপারে দেহ ও মুখের প্রায় সবটাই ঢেকে অটল ও পটল কখন যে তেতলায় গিয়ে উঠল, কেউ তা টের পেলে না।

পরের দিন তেতলায় আর-এক বিচিত্র নাটকীয় দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছিল।

অটল বলছে, নকুল, আমি তোমায় হত্যা করব।

পটল বলছে, তুমি এ কী সর্বনেশে কালো রং কিনে এনেছ? একবাক্স সাবান খরচ করে ফেললুম, তবু এ-রং একটুও ফিকে হবার নাম করছে না!

নকুল বললে, ও-রং যে এত পাকা, আমি কেমন করে জানব ভাই? তবে আমার বিশ্বাস মাস-খানেক ধরে সাবান, সোড়া আর সাজিমাটি ব্যবহার করলে রংটা পাকা হলেও ধীরে ধীরে উঠে যেতে পারে।

অটল চাপা-গলায় গর্জন করে বললে, মাস-খানেক ধরে? এই মাস খানেক ধরে আমরা আর কারুকে মুখ দেখাব না?

নকুল বললে, তবে শিরীষ কাগজ ঘসে দেখবে কি? একটু একটু ছালের সঙ্গে সব রংই উঠে যাবে—' বলেই সে ফস করে দূরে সরে গেল, কারণ পটল তাকে লক্ষ্য করে বিষম এক ঘুসি ছুড়েছিল।

পটল মাথার হাত দিয়ে বললে, হায় হায়, এখন উপায়! নকুলই আমাদের ডোবালে!

নকুল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ভেবো না ভাই, রোসো। ঘরে টারপিন তেল আছে, ওই রঙের ওপরে খানিক ঘষে দাখো দেখি। এই বলেই সে ছুটে গিয়ে ছোটো এক টিন টারপিন তেল নিয়ে এল।

পটল তাড়াতাড়ি সাগ্রহে এক-আঁচলা তেল নিয়ে নিজের মুখময় মাখিয়ে ফেললে। কিন্তু সেই বিলিতি কালো রঙের মধ্যে কী দ্রব্যগুণ ছিল জানি না, টারপিন তেলের সঙ্গে তার মিলন হওয়া মাত্রই পটল বিকট চিৎকার করে তিন হাত উঁচু একটি হাই জাম্প মারলে। তারপর পাগলের মতন নকুলের গা থেকে সাদা ধপধপে আলোয়ানখানা কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ভীষণ ছটফট ও বিষম ছুটোছুটি করতে লাগল। এবং সেই অবস্থাতেই মহা চিৎকার করে বললে, অটল, খবরদার! ও-তেল তুমি মুখে মেখো না! নকুল আমাদের খুন করতে চায়।

অটল গম্ভীর স্বরে বললে, পাগল? আর আমি ও-তেল মাখি? নকুল যে তোমার ওপরেই প্রথম পরীক্ষা করেছে, এইটেই আমার সৌভাগ্য।

ঠিক এমনি সময়েই দরজার কাছটা অন্ধকার হয়ে গেল।

মিনিটখানেক ধরে অটল ও পটলকে নীরব গাম্ভীর্যের সঙ্গে অবলোকন করে নন্দলাল বললে, চিৎকার শুনে দেখতে এলুম। আপনার দুই বন্ধু হঠাৎ একসঙ্গে আলিবাবার আবদালা সেজেছেন কেন?

নকুলও অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললে, অটল আর পটল আবদালা সাজেনি। কাল একটু বেশি রাতে ওরা বাসায় ফিরে আসছে, এমন সময়ে দেড় ডজন জাহাজি-গোরা ওদের আক্রমণ করে—

ইতিমধ্যে মেসের মালিকও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। নকুলের কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল, দেড় ডজন জাহাজ-গোরা? নিশ্চয় তারাই আমাদের

নন্দবাবুর ওপরে অত্যাচার করতে এসেছিল! কিন্তু অটল আর পটলবাবুর মুখ অমন কাফ্রির মতন হল কেন?

নকুল বললে, মাতাল গোরাদের খেয়াল মশাই, খেয়াল! অটল আর পটল তো নন্দবাবুর মতন মহাবীর নয়, মার খেয়ে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর জ্ঞান হলে পর দেখে যে, ওদের এই পোড়া-হাড়ির হাল হয়েছে।

নন্দ খানিকক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চলে যেতে যেতে বলে, আমি এইসব গাঁজাখুরি কথা বিশ্বাস করি না।

...সেই হল অটল, পটল ও নকুলের সঙ্গে নন্দলালের শেষ চোখের দেখা। নন্দ সেইদিনই বাসা ছেড়ে উঠে গেল। অটল ও পটলের মৌখিক বর্ণান্তরের রহস্য সে যে বুঝে ফেলেছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

মধুরেণ সমাপয়েৎ

হঠাৎ কলকাতার রাত্রি হয়ে উঠল বিভীষিকা!

‘ব্ল্যাক আউটের’ অন্ধকার যে ভয়াবহ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ কেবল ভয়াবহ নয়, মারাত্মক!

তৃতীয় শ্রেণির মাসিক পত্রিকায় পদ্য প্রেরণ করা যাদের একমাত্র পেশা, তারা যখন কলকাতার আকাশে অর্ধচন্দ্র দেখে শিবনেত্র হয়ে কবিত্বের স্বপ্নচয়নের চেষ্টা করছিলেন, তখন শূন্যে হল জাপানি উড্ডীয়মান নৌকার উদয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী উপহার লাভ করলে কতিপয় মুখর বোমা। এক দিন নয়, পরে পরে তিন দিন।

নবাব মিরকাসিমের যুগে বাংলা দেখেছিল শেষযুদ্ধ। তারপর থেকে কিছু কম দুই শতাব্দী ধরে বাঙালির সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে কেবল পুথিপত্র বা সংবাদপত্রের ভিতর দিয়ে। চায়ের সঙ্গে যুদ্ধের তর্ক যেমন মুখরোচক, তেমনি নিরাপদ। অনভ্যাসের ফলে বাঙালিরা ভুলে গিয়েছিল, একদা তারাও আবার যুদ্ধে মরতে পারে!

কলকাতার উপরে শেষ অগ্নিবৃষ্টি করেছিল নবাব সিরাজদৌল্লার সেকেলে কামান। তারপর সেদিন আচম্বিতে যখন আকাশচারী খ্যাদা জাপানিরা কলকাতার বুকে আবার নতুন অগ্নিবাদল সৃষ্টি করে গেল এবং কয়েকজন বাংলার মানুষ যখন বিনা নোটিশে হাজির হল গিয়ে পরলোকে, তখন সারা কলকাতা হয়ে গেল ভীত চকিত হতভম্ব! ভাবলে, এ আবার কী-রকম যুদ্ধ বাবা? আগেকার লড়ায়ে লোক মরত রণক্ষেত্রে গিয়ে। কিন্তু এ যুদ্ধে শয়নগৃহে ঢুকে স্ত্রীর আঁচল ধরে শয্যায় শুয়েও দস্তুরমতো খাবি খেতে হয়! এমন যুদ্ধের কথা তো রামায়ণ-মহাভারতেও লেখে না!

তা লেখে না। সুতরাং সুখশয্যাও নিরাপদ নয় এবং বাইরের রাস্তা নাকি ততোধিক বিপজ্জনক যুদ্ধ এসেছে কলকাতার মাথার উপরে। অনভ্যস্ত বাঙালির পিলে গিয়েছে চমকে। শহরবাসীরা 'ব্ল্যাক আউটকে তুচ্ছ করে রাতে পথে পথে করত বায়ু সেবন। কিন্তু তিন দিন জাপানি-বোমার চমকদার ধমক খেয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গেই রাজপথকে করলে প্রায় বয়কট।

'গ্যাস পোস্টের' আলোগুলো জ্বলে না, 'জ্বলছি' বলে মিথ্যা ভান করে। দোকানদাররা তাড়াতাড়ি ঝাঁপ তুলে দিয়ে সরে পড়ে। থিয়েটার, সিনেমা ও হোটেল বা রেস্তোরারও সামনে নিবিড় অন্ধকার যেন দানা পাকিয়ে থাকে। বাদুড় ও প্যাচারা কলকাতার উপর দিয়ে ওড়বার সময় মনে করে,—এমন খাসা শহর দুনিয়ার আর কোথাও নেই! এবং গুন্ডা, চোর ও পকেটমারের দল মনে-প্রাণে জাপানের খ্যাদা-নাকগুলোর মঙ্গল-কামনা করে বেরিয়ে পড়ে পথে-বিপথে।

এমনি সময়ে—অর্থাৎ জাপানিরা শেষ যে-রাতে কলকাতায় বোমা ছুড়ে গেল ঠিক তার পরদিনেই, আমাদের তিনবন্ধু হঠাৎ এই বিচিত্র ঘটনার আবর্তে গিয়ে পড়তে বাধ্য হল। অতঃপর সেই ইতিহাসই বলব।

আহিরীটোলা অঞ্চল। ঘুটঘুটে কালো রাত—জুতোর কালির চেয়ে কালো। চারিদিক সার্কুলার রোডের গোরস্থানের মতো নিস্তব্ধ। শহরের সমস্ত লোক যেন মরে গিয়েছে। কিংবা এ যেন কোনও পরিত্যক্ত ও অভিশপ্ত নগরের মৃত পথ। গত রাত্রে ঠিক এই অঞ্চলেই একটি বোমা পথের উপরে এসে পড়ে পক্ক দাড়িম্বের মতন বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাই এদিককার গৃহস্থের কেউ আর দরজার বাইরে পা বাড়াতে রাজি নয়। পাড়ার বাহিরফটকা ডানপিটে ছেলেরাও বাইরের নাম মুখে আনছে না আজ।

কিন্তু এমন রাতেও পরস্পরের গলা-ধরাধরি করে, তিন জোড়া জুতোর শব্দে রাজপথকে চমকিত করে এগিয়ে আসছে অটল, পটল ও নকুল—জনৈক

রসিক যাদের নাম দিয়েছে 'গৌড়-বাংলার থি মাস্কটিয়ার্স'। ব্যাপার কী? তাদের কি প্রাণের ভয় নেই?

না!

আজকাল আহারের নিমন্ত্রণ পেলে শেয়ালের মতন কাপুরুষ হয়ে ওঠে সিংহের মতন সাহসী।

বাজার যা আক্রা! আগেকার সস্তার দিনে বাড়িতে দুই শত লোককে খেতে ডাকলে অন্তত শতকরা পঁচিশজনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করত না। কিন্তু এখন? দুই শত জনকে আহ্বান করলে সাড়া দেয় চারশে জন মাছ-মাংস, তরি-তরকারি, দুধ-ঘি-তেল সমস্তই অগ্নিমূল্য! যাদের আয় মাসিক একশো টাকার মধ্যে (এবং এই শ্রেণির লোকই বাংলা দেশে বেশি), তারা তো মাছ-মাংস, লুচি বা সন্দেশ-রসগোল্লা প্রভৃতির স্বাদ ভুলে যেতেই বসেছে! এমন অবস্থায় বিনামূল্যে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সদ্ব্যবহার করবার নিমন্ত্রণ পেলে সে সুযোগ ত্যাগ করে না কোনও নিবোধই।

আহিরীটোলা অঞ্চলের কোনও উদার বন্ধু পোলাও কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব ও ফাউল কারি প্রভৃতি খাওয়াবার লোভ দেখিয়েছিলেন। সে-লোভ ত্যাগ করা অসম্ভব। তাই উদরের সম্মান রক্ষার জন্যে হাতে করে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল আজ অটল, পটল আর নকুল।

অবশ্য কেউ যেন মনে না ভাবেন যে, আমরা অটল, পটল, নকুলকে উদর-পিশাচ বলে পরিচিত করতে চাইছি। মোটেই নয় মশাই, মোটেই নয়।

বন্ধুবর কেবল ভুঁড়ি-ভরা ভূরিভোজনেরই লোভ দেখাননি, সেইসঙ্গে এ লোভও দেখিয়েছিলেন, তার বাড়িতে আজ রীতিমতো জলসার আয়োজন। আসর অলংকৃত করবেন দুম-তানানানা খা, সা-গা-রে-মা সাহেব ও গিটকিরি মিয়া প্রমুখ গাইয়েরা এবং ধেড়ে-কেটেতাক সিং ও দি-রি-দা-রা-দা-র আলি প্রমুখ বাজিয়েরা। যাকে বলে আকর্ষণের উপরে আকর্ষণ—নৈবেদ্যের উপরে চূড়াসন্দেশ!

আপনারা আগেই পরিচয় পেয়েছেন যে, আমাদের অটল, পটল, নকুল সংগীতকলার একান্ত ভক্ত। দু-চারটে বোমার ভয়ে এমন বিমল আনন্দকে ত্যাগ করবার ছেলে তারা নয়।

অটল বললে, দুম-তানানানা খাঁ যখন তাল ধরে তাল ঠোকেন, তখন পেশাদার পালোয়ানরা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যায়, এমন গাইয়ে আর হবে না!

পটল সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, আমরা পালোয়ান নই। তাকে সহ্য করতে পারব তো?

নকুল বললে, দি-রি-দা-রা-দা-র আলি যখন প্রিং প্রিং করে সেতার বাজান তখন সন্দেহ হয়, ঠিক যেন তিনি পট পট করে রাগ-রাগিনীর পাকাচুল উৎপাটন করছেন।

পটল অভিভূত হয়ে বললে, এর ওপরে আর কথা চলে না।

অতএব তিন বন্ধু যথাসময়ে হাজির হল যথাস্থানে। গানের আসর ভাঙল রাত বারোটায়। আহারের আসর দেড়টায়। তারা পথে যখন বেরুল ঘড়িতে বাজল রাত দুটো।

হোক গে অন্ধকার—তৃপ্ত উদর, চিত্তে আনন্দ। নকুল খানিক আগে-শোনা একটি গান গাইতে গাইতে পথ চলছিল—

কানহা রে মেরে নাহি রে চুনহরিয়া

হঠাৎ 'টর্চের' একটা তীব্র আলোকরেখা তাদের তিনজনেরই মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল এবং তারপরেই জাগল ফিরিঙ্গি কণ্ঠে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন!

সর্বাগ্রে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারলে নকুল। সে ভীত স্বরে বললে, মারো দৌড়!

তিন ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তিন তিরের মতন তিন মূর্তি ছুটে চলল এক দিকে।

সেখানে দাঁড়িয়েছিল এক সার্জেন্ট এবং একটা পাহারাওয়ালা।

সাজেন্ট চিৎকার করলে, পাকড়ো, পাকড়ো! আসামি ভাগতা হায়!

পাহারাওয়ালা ছুটল। সাজেন্টও।

ব্যাপারটা এই। দিন-দশ আগেকার কথা। কলকাতার রাস্তার এক দেওয়ালের গায়ে লেখা ছিল—Commit no nuisance!'

অটল বেকায়দায় পড়ে বাধ্য হয়ে সেই নিষেধ-বাক্য মানতে পারেনি। ঠিক সময়েই সাজেন্টের আবির্ভাব। সে তাকে থানায় নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। অটল বাধা দেয়, কারণ থানায় যাওয়া তার পক্ষে ছিল আপত্তিকর। সাজেন্ট তাকে একটা ঘুসি মারে। অটল মারে তাকে দুটো ঘুসি। সাজেন্ট পপাত ধরণীতলে। তিন বন্ধুর অন্তর্ধান।

সাজেন্ট এর মধ্যেই তাদের মুখ ভুলতে পারেনি। মণিহারা ফণীর মতন তার দুই চক্ষু ছিল সতর্ক। এমন বোমা-ভয়-ভরা আঁধার রাতেও কার গান গাইবার শখ হয়েছে, কৌতুহলী হয়ে তাই দেখবার জন্যে সে হাতের টর্চ ব্যবহার করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত তিন মূর্তিকে পুনরাবিষ্কার করে ফেলেছে।

হিংস্র জন্তুর চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে যম। এবং যমের চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে বাংলা দেশের পুলিশ। এই হচ্ছে তিন বন্ধুর মত। অতএব পুলিশের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে যাবার জন্যে তিন বন্ধু কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করলে না।

নকুল জানে, প্রথম জীবনে স্পোর্টে'র দৌড় প্রতিযোগিতায় বরাবরই সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সুতরাং একটা গোরুখের সাজেন্ট ও একটা ছাতুখোর পাহারাওয়ালা যে দৌড়ে তাকে হারাতে পারবে না, এ বিষয়ে ছিল নিশ্চিত।

পটল সম্বন্ধেও সে হতাশ নয়। কারণ পটল হচ্ছে বাখারির মতন রোগা লিকলিকে। তাই তার নাম হয়েছে মানুষ-হাড়গিলে।

ভয় তার কেবল অটলকে নিয়ে। অটলকে তারা ডাকত নরহস্তী' বলে এবং ওজনে সে দুই মন সাড়ে আটত্রিশ সের। একবার তেতলার সিড়ি ভাঙলেই সে হুস হুস করে হপ ছাড়ত পাঁচ মিনিট ধরে এবং আধ মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে শুনলেই ট্যাক্সি ডাকতে বলত।

কিন্তু নকুলের দুশ্চিন্তা অমূলক। ভয় পেলে মহা মোটা হিপোপটেমাসও তার খুদে খুদে পা চালিয়ে দৌড়ে যে-কোনও মানুষকে হারিয়ে দিতে পারে। এবং ভয় পেয়ে পালাবার দরকার হলে যে-কোনও গুরুভার বাঙালিরও দেহ হয়ে যায় যে তুলোর মতন হালকা, আজ তার একটা চক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

ছুটতে ছুটতে নকুল বললে, অটল, পিছিয়ে পড়লে বাঁচবে না।

ছুটতে ছুটতে পটল বললে, অটল, তোমাকে নিয়েই ভাবনা!

অটল কিছু বললে না, কিন্তু এক দৌড়ে বন্দুকের বুলেটের মতন বেগে পটল ও নকুলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল!

পটল ও নকুল এখন পুলিশের কথা ভুলে প্রাণপণে অটলের নাগাল ধরবার চেষ্টা করতে লাগল—কিন্তু অসম্ভব, সে মাটি কাঁপিয়ে ধেয়ে চলেছে যেন ঝোড়ো হাতির মতন। পটল ও নকুল চমৎকৃত!

অটল ছুটছে, ছুটছে, ছুটছে। সে খালি ছুটছে না, নিজের দৃষ্টিকেও করে তুলেছে বিড়ালের মতন অন্ধকারভেদী! নইলে এই ব্ল্যাক আউটের রাতে কলকাতার শতবাধাময় পথে দৌড় প্রতিযোগিতায় সফল-মনোরথ হবার সম্ভাবনা অল্পই।

পিছনে ধাবমান পুলিশের দ্রুতপদশব্দ শুনতে শুনতে তারা ঢুকে পড়ল একটা গলির ভিতরে—প্রথমে অটল, তারপর নকুল, তারপর পটল।

ছুটতে ছুটতে অটল দেখলে, একেবারে ঠিক তার সামনেই পথ জুড়ে শুয়ে আছে একটা বিরাট সাদা ষাঁড়ের দীর্ঘ ছায়া। তখন তাকে আর পাশ কাটাবার সময় নেই, অতএব অটল বিনা দ্বিধায় অমন বিপুল বপু নিয়েও একটি চমৎকার লং জাম্প মেরে ষাড়টাকে পার হয়ে গেল অনায়াসেই। তারপর লাফালে নকুল। তারপর পটল।

সচমকে ঘুম ভেঙে গেল ষাঁড়ের। বিপুল বিস্ময়ে মুখ তুলে সে দেখলে, তার দেহ ও মাথার উপর দিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফ মেরে চলে গেল তিন-তিনটে মূর্তি। এমন কাণ্ড সে আর কখনও দেখেনি।

নিজের ষণ্ড-বুদ্ধিতে ব্যাপারটা সে তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছে, এমন সময়ে তার সুদীর্ঘ কর্ণে প্রবেশ করল আবার কাদের নতুন পায়ের শব্দ! সে আন্দাজ করলে, এ দুরাত্মারাও হয়তো তার পবিত্র দেহের উপর দিয়ে লম্ফত্যাগ করবে। সে এমন অন্যায় আবদারকে আর প্রশয় দিতে রাজি নয়। ঘৃণ্য ও তুচ্ছ মনুষ্য-জাতীয় জীববৃন্দকে 'হার্ডল রেসে' সাহায্য করবার জন্যে সে ষণ্ড-জীবন ধারণ করেনি। অতএব ভীষণ এক গর্জন করে ধড়মড়িয়ে দণ্ডায়মান হল বৃষবর। এবং পরমুহূর্তেই ফিরে শিংওয়ালা মাথা নেড়ে, পতাকার মতন লাঙ্গুল উর্ধ্বে তুলে নতুন পদশব্দের উদ্দেশে হল সতেজ ও সবেগে ধাবমান। মুখে তার ঘন ঘন ঘোঁৎ ঘোঁৎ হুঙ্কার।

সেই বিভীষণ মূর্তি দেখেই পাহারাওয়ালা ও ফিরিঙ্গিপুঙ্গবের চক্ষুস্থির। তারাও ফিরে অদৃশ্য হতে দেরি করলে না।

পিছনের পাপ যে বিদায় হয়েছে, তিন বন্ধু তখনও তা টের পায়নি। তারা তখনও ছুটছে উল্কাবেগে।

হঠাৎ সামনে জাগল প্রায় ছয়-সাত হাত উচু প্রাচীর। কিন্তু কী ছার সেই বাধা, পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্যে তারা চিনের প্রাচীরও পার হতে প্রস্তুত।

অটল আজ যেন ইচ্ছা করলে পাখির মতন শূন্যে উড়তে পারে। লাফ মেরে সে উঠল প্রাচীরের টঙে এবং আর একলাফে অদৃশ্য হল প্রাচীরের ওপারে। তারপর একে একে পটল নকুল করলে তার অনুসরণ।

সেই বোমাভীত, অস্বাভাবিক স্তব্ধ রাতে যখন একটা সূচ পড়লেও দূর থেকে শোনা যায়, তখন নকুল, পটলও বিশেষ করে অটলের মতন সুবৃহৎ দেহের ধুপ ধুপ ধুপ করে লম্ফত্যাগের শব্দ অন্য লোকের শ্রুতিগোচর হবে, তাতে আর সন্দেহ কী?

প্রাচীরের উপর থেকে তিন বন্ধু লাফ মেরে অবতীর্ণ হল একটা অজানা বাড়ির অন্ধকার উঠানের উপরে।

কিঞ্চিৎ হাঁপ ছাড়বার চেষ্টা করছে, হঠাৎ বিকট স্বরে চিৎকার হল, চোর! চোর! ডাকাত! সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের গোলমাল ও ছুটোছুটির শব্দ সর্বনাশ, এ যে তপ্ত কড়া থেকে জলন্ত উনুনে!

তিন বন্ধু আঁতকে আবার উঠল, আবার ছুটল। সামনেই একটা দরজা। ঠেলা মারতেই খুলে গেল। তারা একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ওরে বাপ রে বাপ, সেখানে আবার একটিমাত্র মেয়ে-গলায় ঘর-ফাটানো কী বিকট চিৎকার!

—খুন করলে, খুন করলে—ডাকাতে খুন খুন করলে গো! অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় কেবল চিৎকারের পর চিৎকার!

তিন বন্ধু সিকি-সেকেন্ড থমকে দাঁড়াবারও অবসর পেলে না, টাল খেতে খেতে আবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল....

ওদিকে চারিদিক থেকে ছুটে এল বাড়ির পুরুষরা চাকর-বাকর দারোয়ান! তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে যে যা পেয়েছে সংগ্রহ করে এনেছে—বটি, কাটারি, লাঠি!

বাড়ির কর্তা হস্তদন্তের মতন ঘটনাস্থলে এসে বললেন, কই রে প্রমদা, কোথায় ডাকাত?

একটি আধাবয়সি মেয়ে ঘরের কোণ ছেড়ে এগিয়ে এসে বললে, "ওই যে দাদা, ওই যে আবার বেরিয়ে গেল গো!

—'ক-জন?

—এক কড়ি লোক গো, এক কড়ি লোক! কী সব রাক্ষুসে চেহারা, এয়া গালপাট্টা, এয়া গোঁফ—আর রং যেন কালিমাখানো হাড়ি!

একটি যুবক বিরক্ত স্বরে বললে, কী যে বলো পিসিমা, তোমার কথার কোনও মানে হয় না।

প্রমদা কপালে দুই চোখ তুলে বললে, ছেলের কথা শোনো একবার! দেখলুম এক কাঁড়ি আস্ত ডাকাত, তবু বলে মানে হয় না!

যুবক বললে, সত্যি কথাই বলেছি পিসিমা! এই ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার, এর মধ্যেও তুমি দেখতে পেলে, ডাকাতদের গায়ের রং কালো হাড়ির মতন, আর তাদের মুখে এঁয়া গোঁফ, এয়া গালপাট্টা!

প্রমদা বললে, নিমে, তুই তো সেদিনকার ছেলে, তুই কী জনবি বল? আগুনের আঁচ কি চোখে দেখে বুঝতে হয়, গায়ে লাগলেই টের পাওয়া যায় যে! ডাকাতদের চেহারা অন্ধকারেও আন্দাজ করা যায় রে, অন্ধকারেও আন্দাজ করা যায়!

কর্তা অধীর স্বরে বললেন, চুলোয় যাক যত বাজে কথা। বলি, ডাকাতগুলো গেল কোন দিকে?

প্রমদা বললে, ওই দিকে দাদা, ওই দিকে!

কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোনওদিকেই ডাকাতদের আর পাত্ত পাওয়া গেল না।

কর্তা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, যাক গে, আপদ গেছে। বেটারা পালিয়েছে বলে আমি দুঃখিত নই।

কর্তা আবার নিজের শয়নগৃহে এসে ঢুকলেন। তিনি বিপত্নীক। একলাই শয়ন করেন।

আলো নিবিয়ে তিনি খাটের উপরে গিয়ে উঠলেন। তারপর শুয়ে করতে লাগলেন নিদ্রাদেবীর আরাধনা। কিন্তু মন যখন উত্তেজিত, ঘুম সহজে আসে না।

—হ্যাঁচ্চো?

কর্তা সবিস্ময়ে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। তাঁর ঘরে হেঁচে ফেললে কে?

আবার—হ্যাঁচ্চো!

হাঁচির জন্ম খাটের তলায়, এটা বোঝা গেল। কিন্তু খাটের তলায় হাঁচি কেন বাবা কর্তা তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়ে আলোর সুইচ টিপতে গেলেন।

এবার আর হাচি নয়, খাটের তলা থেকে নির্গত হল মনুষ্যের কণ্ঠস্বর!

কে বললে, খবরদার!

কর্তা ম্রিয়মান কণ্ঠে বললেন, খবরদার বলছ কে বাবা?

—আমি!

—তুমি কে বাবা?

—মনুষ্য।

—অর্থাৎ ডাকাত?

—আমরা ডাকাত নই।

—ও, তাহলে তোমরা যিশু খ্রিস্ট?

—আমরা যিশু খ্রিস্ট নই।

—উত্তম। তোমাদের পরিচয় জানতে চাই না। কিন্তু দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে এখানে কেন?

—পথ ভুলে।

—ভুলটা বিস্ময়কর।

—কিন্তু অসম্ভব নয়।

—পথ ভুলে আমার খাটের তলায়? না বাপু, এ কথা জজে মানবে না।

—খাটের তলা হচ্ছে অতি নিরাপদ ঠাঁই। খাসা আছি মশাই!

—বুঝলুম। কিন্তু আমাকে কী করতে বলো?

—চ্যাঁচাবেন না। আলো জ্বলবেন না। আবার বিছানায় গিয়ে উঠে বসুন।

—কথা যদি না শুনি?

—আমার কাছে ভোজলি আছে।

আর একটা কণ্ঠস্বর বললে, আমার কাছে রিভলভার আছে।

আর একটা কণ্ঠস্বর বললে, আমার কাছে বন্দুক আছে।

—দেখছি দলে তোমরা ভারী। কিন্তু আর কিছু সঙ্গে করে আনোনি? কামান-টামান?

—বিছানায় উঠলেন না? আবার ঠাট্টা হচ্ছে? আচ্ছা!

খাটের তলায় একাধিক ব্যক্তির হামাগুড়ি দেওয়ার শব্দ শোনা গেল।

ডাকাতরা বাইরে বেরিয়ে আসছে। কর্তা সুড় সুড় করে আবার খাটের উপরে গিয়ে উঠলেন বিনাবাক্যব্যয়ে।

—এইবারে আমরা কী করব জানেন?'

—আমার গলায় ছুরি দেবে?

—না। আপনার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলব।

—এত দয়া কেন?

—আমরা চাই না যে আপনি চ্যাঁচান বা আমাদের তাড়া করেন।

—আমি কিছুই করব না, তোমরা নির্ভয়ে প্রস্থান করো।

—আপনার কথায় বিশ্বাস নেই।

—জয় গুরু!

—কী বললেন?

—জয় গুরু। বিপদে বা সমস্যায় পড়লেই জয় গুরু বলা আমার স্বভাব।

—আশ্চর্য! আমার মেসোমশাইয়েরও ঠিক ওই স্বভাব।

—কার?

—আমার মেসোমশাইয়ের। আপনার গলার আওয়াজও তার মতন।

—আমার ভায়রা-ভাইয়ের ছেলের গলাও তোমার মতন। কিন্তু সে তোমার মতন ডাকাত নয়।

—আপনিও আমার মেসোমশাই নন। কারণ তার বাসা বউবাজারে।

—কী বললে?

—এটা বউবাজার হলে আপনাকেই আমার মেসো বলে সন্দেহ হত।

—তোমার মেসোর নাম কী?

—চন্দ্রনাথ সেন।

—আমারও নাম ওই। আমিও বউবাজারে থাকতুম, আজ দশ দিন হল, এই নতুন বাসায় উঠে এসেছি।

অটল ফস করে আলো জ্বাললে।

কর্তা বললেন, আটলা!

অটল বললে, মেসোমশাই!

অল্পক্ষণের স্তব্ধতা। কর্তা কঠিন কণ্ঠে বললেন, অটল, এ ব্যবসা কতদিন ধরেছ?

অটল কর্তার দুই পা জড়িয়ে ধরে বললে, আমি ডাকাত নই মেসোমশাই, আগে আমার কথা শুনুন।

অটল একে একে সব কথা খুলে বললে।

কর্তার অট্টহাস্যে খালি বাড়ি নয়, রাত্রির বুক পর্যন্ত যেন কাঁপতে লাগল—

হো হো হো হো, হা হা হা হা! ওরে আটলা, আজ আমি হেসে-হেসেই খাবি খাব রে! হি হি হি হি! ওরে প্রমদা, তোর গালপাট্টাঅলা কেলে-হাড়ির মতন ডাকাতের মুখগুলো একবার দেখে যা রে! হো হো হো হো, হা হা হা হা হা হা হা হা...